বিশাল গড়ের দুঃশাসন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

বিশাল গড়ের দুঃশাসন

হেমেন্দ্রকুমার রায়

পুর্বার্ধ

ছিটগ্রস্ত রাজাবাহাদুর

বিশালগড় আগে ছিল স্বাধীন দেশীয় রাজ্য। বিশালগড়ের স্বাধীনতা আজ আর নেই বটে, কিন্তু তার অধিকারীকে এখনও লোকে স্বাধীন রাজার মতোই ভয় ও ভক্তি করে। তার নাম রাজা রুদ্রপ্রতাপসিংহ।

মধ্যভারতের বিন্ধ্য শৈলমালার ছায়ায় বসে এই বিশালগড় আজও যেন তাকিয়ে আছে সেই সুদূর অতীতের দিকেই। তার চারিপাশেই আধুনিক সভ্যতার চিহ্ন নেই কিছুমাত্র। কারণ, রাজার জমিদারি থেকে অনেক তফাতেই নির্মাণ করা হয়েছে এই বিশালগড় নামে দুর্গপ্রাসাদখানি। তার চারিদিকেই বিরাজ করছে ছোটো-বড়ো পাহাড়ের পর পাহাড়, গিরিশিখরের পর গিরিশিখর, বিপুল অরণ্যের গহন শ্যামলতা, শস্যহীন প্রান্তর, কলরবে মুখরা গিরিতরঙ্গিনী। সেখানে শব্দ সৃষ্টি করে কেবল নিবিড় বনের পত্রমর্মর ও নানান জাতের বিহঙ্গেরা, এবং সেখানে নৈশ আকাশের স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে থেকে থেকে নিশাচর বাদুড়ের আন্দোলিত পক্ষ, আর কালপেচকের কর্কশী কণ্ঠ, আর বনবাসী হিংস্র পশুদের ভয়াল গর্জন। লোকালয় থেকে অনেক দূরে এমন এক স্থানে বিশালগড়ের দুর্গপ্রাসাদটি নির্মাণ করা হয়েছে যে, হঠাৎ দেখলে মনে হয়, তার মধ্যে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার নেই। একটিমাত্র পথ দিয়ে প্রাসাদের তোরণদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হওয়া যায়। সে পথও এমনি দুর্গম ও বন্ধুর যে, কোনও সাধারণ পথিককেই তা আকৃষ্ট করতে পারে না। কখনও নতোন্নত পাহাড়ের উপর

দিয়ে, কখনও বেগবতী স্রোতস্বতাঁর উপরকার জীর্ণ সেতুকে আশ্রয় করে, কখনও ধু-ধু প্রান্তরের একটি অংশকে চিহ্নিত করে এবং কখনও বা দিনের বেলাতেও বিজন বনের অন্ধকারকে ভেদ করে সেই সুদীর্ঘ পথ অজগরের মতো এঁকেবেঁকে অগ্রসর হয়ে গিয়েছে বিশালগড় অভিমুখে।

এই বিচিত্র দুর্গপ্রাসাদের বয়স কত, এখনকার কেউ তা জানে না। তবে আকার দেখে মনে হয়, বহু শতাব্দীর বহু ঋতু তার উপরে রেখে গিয়েছে আপন-আপন হাতের চিহ্ন। অভিশপ্ত তার মূর্তি! কোথাও তার কঠিন পাথরের দেওয়াল ভেদ করে বেরিয়ে শূন্যের দিকে বাহু বিস্তার করেছে রীতিমতো বড়ো বড়ো অশ্বখ ও বটবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, কোথাও তার দেওয়ালের বাঁধন ছেড়ে নীচেকার ভূমিকে আশ্রয় করেছে ছোটো-বড়ো পাথরের পর পাথরের খণ্ড, এবং কোথাও বা তার সু-উচ্চ দেওয়াল এমনভাবে হেলে পড়েছে যে দেখলেই মনে হয়, তারা সশব্দে মাটির উপরে আছড়ে পড়বে এই মূহুর্তেই। লোকে বিশালগড়ের রাজাবাহাদুরকে জানে ধনকুবের বলে। কিন্তু বিশালগড়ের ছন্নছাড়া মূর্তি দেখলে লোকের এই ধারণাকে একটুও সত্য বলে মনে হয় না। রাজার সম্বন্ধে লোকে আরও অনেক আশ্চর্য্য কথাই বলে। কিন্তু সে সব কথায় কান পাতবার আগে আপনারা আমার কাহিনী শ্রবণ করুন। আমি যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি, তাই এখানে অকপটে লিপিবদ্ধ করতে চাই। এ কাহিনী এতই ভয়াবহ এতই রোমাঞ্চকর এবং এতই অপার্থিব যে, শেষ পর্যন্ত হয়তো অনেকেই আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইবেন না। অনেকে আমাকে যদি উন্মাদগ্রস্ত বলে ভাবেন, তাহলেও আমি বিস্মিত হব না। কিন্তু লোকের বিশ্বাসে অবিশ্বাসে কিছুই এসে যায় না। আমার। কারণ আমি নিজে স্বচক্ষে যা দর্শন করেছি তা অসত্য নয় বলেই মনে করি।

এইবারে আমার নিজের কথা আরম্ভ। আমি কলকাতার এক অ্যাটর্নি-বাড়ির শিক্ষানবিশ, এবং নিজেও অ্যাটর্নি হবার জন্যে শেষ পরীক্ষণ দিয়েছি। বিশালগড়ের রাজা আমাদের অফিসে পত্র লিখে জানিয়েছেন যে, কলকাতার উপকণ্ঠে কয়েক বিঘা জমি সমেত তিনি একখানি সুবৃহৎ বাগানবাড়ি ক্রয় করতে চান। এবং সেইসঙ্গে তিনি আর একটি অদ্ভুত অনুরোধও করেছেন। বাগানবাড়িখানি খুব জীর্ণ ও পুরাতন হলেই তিনি অত্যন্ত খুশি হবেন। এ-রকম অদ্ভুত অনুরোধ আমাদের অফিসে আর কখনও আসেনি।

কর্তা আমাকে ডেকে বললেন, দ্যাখো বিনয়, লোকটির মাথায় বোধহয় দস্তুর মতো ছিট আছে। কিন্তু তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। সে পাগলাই হোক, আর ছিটগ্রস্তই হোক, মক্কেল হচ্ছে মক্কেল। আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য পেলেই আমরা তুষ্ট হব। কী বলে, তোমার কী মত?

—আজ্ঞে, আমারও ওই মত।

—এখন শোনো। এই ছিটগ্রস্ত রাজাবাহাদুরটি যে-রকম বাড়ি চান, সৌভাগ্যক্রমে ঠিক সেইরকমই একখানা বাড়ি আমাদের হাতে আছে। কলকাতার খুব কাছেই ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে থাকলেও ওই বাড়িখানাকে কেউ কিনতে চায় না। কারণ সবাই বলে, ওখানা নাকি ভূতুড়ে বাড়ি। আমি মনে করছি, রাজাবাহাদুরকে ওই বাড়িখানিই কিনতে বলব।

আমি বললুম, কিন্তু সেটা কি উচিত হবে?

—কেনো হবে না?

—রাজা পুরোনো বাড়ি চেয়েছেন বটে, কিন্তু ভূতুড়ে বাড়ির উপরে তাঁর কোনও লোভ না থাকতেও পারে।

কর্তা বললেন, বাপু, আমি মক্কেলকে ঠকাব না। তিনি কেনবার আগেই তাঁকে ওই দুর্নামের কথা জানিয়ে দেব। কিন্তু সে কথা যাক। এখন তোমাকে ডেকেছি কেন, শোনো। রাজা থাকেন মধ্যভারতের বিশালগড়ে। তুমি কি বিশালগড়ের নাম শুনেছ?”

—আজ্ঞে না, বিশালগড় যে কোথায় তাও আমি জানি না।

—তোমার জানবার বিশেষ দরকারও নেই। কারণ, একখানি কাগজে পথের সমস্ত খুঁটিনাটি লিখে তোমার হাতে আমি দেব। তা দেখলেই তুমি অনায়াসে যথাস্থানে গিয়ে হাজির হতে পারবে, কারন আমি স্থির করেছি, বিশালগড়ের রাজার কাছে পাঠাব তোমাকেই। রাজার সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহারও হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, যথাস্থানে আর যথাসময়ে আমার প্রতিনিধির জন্যে তাঁর গাড়ি উপস্থিত থাকবে। কালই তোমাকে বিশালগড়ে যাত্রা করতে হবে।

দুই শরীরী প্রেত

যথাসময়ে রেলপথে বিশালগড় এস্টেটের কাছারিবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। কিন্তু সেখানে থেকে আরও পঞ্চাশ মাইল দূরে। রাজা নাকি বেশির ভাগ সময়েই সেইখানেই থাকনে এবং তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলেও আমারও সেখানে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

কাছারিবাড়িতে আমার নামে লেখা রাজা রুদ্রপ্রতাপের একখানি পত্রও পেলুম। তাতে লেখা আছে:

প্রিয় বিনয়বাবু,

আশা করি আপনি নিরাপদে আমার দেশে এসে পৌঁছেছেন। ওখান থেকে আমার প্রাসাদ অবশ্য খুব কাছে নয়, কিন্তু সেজন্যে আপনার চিন্তার কারণ নেই, কারণ ওখান থেকে গোরুর গাড়ি চড়ে আপনি অনায়াসে 'পঞ্চগ্রাম' পর্যন্ত আসতে পারবেন! সকালে বা দুপুরে কোনও একটা সময়ে গোরুর গাড়ি আপনাকে পঞ্চগ্রামে পৌঁছে দেবে। সেখানে একখানি সরাই আছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনি সেইখানেই অপেক্ষা করবেন। তারপর আমার নিজের গাড়ি আপনাকে আনবার জন্যে পঞ্চগ্রামে উপস্থিত হবে। ইতি

রুদ্রপ্রতাপ'

পঞ্চগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সরাই খুঁজে নিতে দেরি হল না। ছোটো সরাই, আমার মতন আরও কয়েকজন পথিকও এখানে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এবং তাদের তদারক করছেন একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তিনিই নাকি সরাইয়ের মালিক। তিনি বিধবা; এই সরাই থেকে যে আয় হয় তার দ্বারাই তার সংসার চলে যায়।

আমার মতন লোক এই সরাইয়ে বোধহয় বেশি আসে না। কারণ, আমার পরিচ্ছদ দেখে অনেকেরই চোখ হয়ে উঠল যেন সচকিত। তারা চুপিচুপি পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা কইতে লাগল। কিন্তু তাদের চোখ-মুখ দেখে বেশ বুঝলুম যে তারা আলোচনা করছে আমার সম্পর্কেই। সরাইয়ের বৃদ্ধা অধিকারিণী হিন্দি ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললুম, আমি কলকাতা থেকে আসছি, যাব বিশালগড় রাজপ্রসাদে।

বৃদ্ধা যে রীতিমতো চমকে উঠলেন, সেটা আমার নজর এড়াল না। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, আপনি বিশালগড় রাজপ্রাসাদে যাবেন! কেন?

—রাজাবাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকে ডেকেছেন।

বৃদ্ধার মুখের উপর দিয়ে যেন কেমন একটা কালো ছায়া পড়েই আবার মিলিয়ে গেল। তিনি যেন উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠলেন, রাজাবাহাদুর আপনাকে ডেকেছেন! রাজা রুদ্রপ্রতাপ?

—হ্যাঁ, তিনিই। কিন্তু রাজার নামে আপনি যেন কিছু বিচলিত হয়েছেন। এর কারণ কী?

বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, এর কিছুই কারণ নেই বাবুজি! আপনি তো সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানেই থাকবেন? আসুন, আপনার ঘর দেখিয়ে দি।

দুপুরে খাবার জন্যে আমার ডাক পড়ল। খাবার ঘরে আমার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক প্রবেশ করল। সকলে একসঙ্গে খেতে বসল।

খেতে খেতে বেশ লক্ষ করলুম, সকলেই আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে। সকলেরই চোখে ফুটে উঠেছে যেন একটা ভয়ের ও করুণার ভাব। মনে মনে ভাবতে লাগলুম, এ-রকম দৃষ্টির অর্থ কী হতে পারে?

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হঠাৎ একটি মাঝবয়সি লোক আমার দিকে চেয়ে বললেন, মিশাই, ক্ষমা করবেন। আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি, কি?

—শুনলুম, আপনি নাকি বিশালগড়ের রাজবাড়িতে যাচ্ছেন?

—ঠিকই শুনেছেন।

—আপনি এর আগে কখনও এখানে এসেছেন?

—না।

—"বিশালগড়ের রাজাবাহাদুরের সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

—না।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, এখন থেকে বিশালগড়ের রাজবাড়ি হচ্ছে ত্রিশ মাইল দূরে। কেমন করে আপনি এই পথটা পার হবেন?

—রাজাবাহাদুরের গাড়ি আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে সন্ধ্যার সময় এখানে আসবে।

ঘরের ও-কোণ থেকে হঠাৎ আর-একজন লোক ত্রস্ত কণ্ঠে বলে উঠল—আজ হচ্ছে অমাবস্যার শনিবার!

আর-একজন লোক সঙ্গে সঙ্গে ঠিক তেমনি স্বরেই বললে, তার উপরে আবার সন্ধ্যার সময়ে।

আরও তিন-চারজন লোকের কণ্ঠে ফুটল অস্ফুট আর্তধ্বনি! ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারলুম। না। অবাক হয়ে এর-তার-ওর মুখের দিকে তাকাতে লাগলুম। অমাবস্যার শনিবারের সন্ধ্যা এদের কাছে এমন কী গুরুতর অপরাধ করেছে?

কৌতূহল দমন করতে না পেরে শেষটা জিজ্ঞাসা করলুম, মশাই, অমাবস্যার শনিবারের সন্ধ্যা নিয়ে আপনাদের এত বেশি মাথাব্যথা কেন? দেখছি, আপনারা তাকে মোটেই পছন্দ করেন না!

খানিকক্ষণ কেউ আর কোনও সাড়া দিলে না; সকলে আহার করতে লাগল। নীরবে। খাওয়াদাওয়া যখন শেষ হয়েছে এবং আমি যখন উঠি-উঠি করছি, তখন প্রথম যে মাঝবয়সি লোকটি কথা কয়েছিলেন তিনি বললেন, আর একটু বসুন। আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

জিজ্ঞাসু চোখে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে আমি স্থির হয়ে বসে রইলুম।

ভদ্রলোক প্রায় আমার কানের কাছে মুখ এনে অতি মৃদুস্বরে বললেন, এ অঞ্চলের সবাই কী বিশ্বাস করে জানেন? বিশালগড়ের দিকে যেতে ওই যে নিবিড় অরণ্য দেখছেন, প্রতি অমাবস্যার শনিবারে সেখানে যখন রাত্রির অন্ধকার নেমে আসে তখন বনের ভিতরে যে-সব নিশাচর আনাগোনা করে, লোকে বলে তারা মানুষ নয়।

আমি হেসে বললুম, রাত্রে বনে বনে যারা বেড়ায় তারা যে মানুষ নয়, একথা সকলেই জানে। বনের জীব হচ্ছে বাঘ, ভালুক, শেয়াল। তারাই তো নিশাচর।

ভদ্রলোক মাথা নেড়ে বললেন, না মশাই, আমি বাঘ-ভালুকের কথা বলছি না।

—তবে আপনি কাদের কথা বলছেন?

আমি মুখে আনতে পারব না। এইটুকু জেনে রাখুন, তারা বাঘ-ভালুকও নয়, আর মানুষও নয়।

আমি হো-হো করে হেসে উঠে বললুম, ও, আপনি বুঝি ভূত-প্রেতের কথা বলছেন? কিন্তু আমরা হচ্ছি কলকাতার ছেলে, কলেজে বিজ্ঞান পড়েছি। 'ভূতপ্রেত' শব্দ আমাদের অভিধানে নেই। ভূত আমি বিশ্বাস করি না। আর ভূত থাকলেও তারা তো অশরীরী, আমাদের মতো শরীরী মানুষের কোনওই অনিষ্ট তারা করতে পারে না।

ভদ্রলোক আর কিছু বললেন না। একটা হতাশাব্যঞ্জক মুখভঙ্গি করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ওদিক থেকে আর-একজন লোক বললে, বাবুজি, আপনি কি শরীরী প্রেতের কথা কখনও শোনেননি?

—না। কখনও শুনিওনি, কখনও দেখিওনি, আর কখনও দেখবার বা শোনবার আশাও করি। না। এই বলে আমিও আসন ছেড়ে উঠে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

পথশ্রমে শরীরটা কিছু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঘণ্টাচারেক একটানা নিদ্রার পর জেগে উঠে দেখি, সন্ধ্যাসমাগমের আর বেশি বিলম্ব নেই। জানলা-পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, সামনের নিবিড় অরণ্যের উপর দিয়ে দলে দলে বক আর বুনো হাঁস বাসার দিকে উড়ে যাচ্ছে। নীচের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার পরও একজন মানুষও নজরে পড়ল না। সবাই যেন সন্ধ্যার আগেই সেখান থেকে সরে পড়েছে। কোন অজানা আতঙ্কে। কিছুক্ষণ মাথা ঘামিয়েও সেই আতঙ্কটা যে কী তা আন্দাজ করতে পারলুম না। শরীরী প্রেত? প্রেত কি কখনও শরীরী হতে পারে? প্রেতের কথা যদি মানা যায় তাহলেও দেখা যায়, মানুষের আত্মা নিরেট দেহ ত্যাগ করবার পরই 'প্রেতাত্মা' আখ্যা লাভ করে। তার পক্ষে শরীরী হবার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

এইসব ভাবতে ভাবতে চারিদিক ছেয়ে গেল সন্ধ্যার অন্ধকারে। তারপরেই দেখতে পেলুম, অরণ্যের ওদিককার অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে আসছে দুটো আলো। ঘোড়ার পায়ের ও গাড়ির চাকার শব্দও শুনতে পেলুম।

কিছুক্ষণ পরে একখানা গাড়ি এসে থামল সরাইয়ের সামনে।

নীরবে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে তিনি বললেন, বাবুজি, রাজাবাহাদুরের গাড়ি এসেছে।

আমি তখন উঠে পড়ে নিজের সুটকেসটা গুছিয়ে নিতে লাগলুম। বৃদ্ধা তখনও সেখান থেকে চলে গেলেন না। আমি ভাবলুম, তিনি নিজের

পাওনা বুঝে নিতে এসেছেন। মনিব্যাগটা বার করে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনাকে কত দিতে হবে?

বৃদ্ধা স্নান হাসি হেসে বললেন, বাবুজি, আপনার যা খুশি হয় দেবেন। আমি পাওনা আদায় করবার জন্যে এখানে আসিনি।

—তবে আপনি কী চান?

—আমি কিছু চাইতে আসিনি। আমি খালি জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, আপনি কি সত্যসত্যই ওই গাড়িতে চড়ে আজ রাত্রে বিশালগড়ে যেতে চান?

—নিশ্চয়ই।

—কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে কি চলবে না?

—না। কাল সকালে আবার আমি এখানে ফিরে এসে দুপুরের ট্রেনে কলকাতায় যেতে চাই।

বৃদ্ধা বললেন, কিন্তু রাজা কি আপনাকে ফিরতে দেবেন?

আমি একটু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ফিরতে দেবেন না মানে?

বৃদ্ধা ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, না বাবুজি, আমার কথার কোনও মানে নেই। আমি শুধু কথার কথা বললুম। আচ্ছা, আজ যদি নিতান্তই যেতে চান, তাহলে একটু অপেক্ষা করুন, আমি আবার আসছি।

বৃদ্ধা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি আবার সুটকেসটা গুছিয়ে নিতে লাগলুম। একটু পরেই বৃদ্ধা আবার ফিরে এলেন, তারপর আমার কাছে এসে সস্নেহে বললেন, আমার একটি ছেলে ছিল, আপনাকে অনেকটা তারই মতো দেখতে।

—আপনার সে ছেলেটি এখন বেঁচে নেই?

বৃদ্ধার দুই চক্ষু হয়ে উঠল সজল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, না। বাবু, আজ তিন বছর তাকে হরিয়েছি। আপনাকে দেখে তার

কথা আবার নতুন করে আমার মান জেগে আমি দরদভরা কণ্ঠে বললুম, আহা, আপনার কথা শুনে আমারও দুঃখ হচ্ছে। আপনার ছেলের কী অসুখ হয়েছিল?

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বৃদ্ধা বললেন, বাবুজি, তার কোনওই অসুখ হয়নি। এক রাতে ওই বনের ভিতরে গিয়ে সে আর আমার কাছে ফিরে আসেনি। তাই তো আমি ভয় পাচ্ছি। বাবুজি, তাই তো আমার ইচ্ছা নয় যে আজ রাত্রে আপনি ওই বনের ভিতরে যান।

বৃদ্ধার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝে আমি সহানুভূতি-মাখা স্বরে বললুম, না মা, আমার কোনও বিপদ হবে না—আমি তো যাচ্ছি। রাজাবাহাদুরের গাড়িতে।

অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে বৃদ্ধা বললেন, তাই তো আমার বেশি ভয় হচ্ছে বাবুজি, তাই তো আমি আপনার জন্যে এত ভাবছি!

আমি আবার বিস্মিত কণ্ঠে বললুম, রাজাবাহাদুরের গাড়িতে যাচ্ছি বলে আপনার ভয় আরও বেড়ে উঠেছে! এ কেমন কথা?

বলছি। আজ আমার মাথার ঠিক নেই। কিন্তু ওসব কথা যাক। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

—কী অনুরোধ?

কাপড়ের ভিতর থেকে একটা জিনিস বার করে বৃদ্ধা বললেন, এই কবচখানা আমি আপনার গলায় পরিয়ে দিতে চাই। এতে আপনি আপত্তি করবেন না তো?

—কী আশ্চর্য, আমার জন্যে আপনি কবচ এনেছেন কোন! এ কবচ নিয়ে আমি কী করব?

—আপনাকে কিছুই করতে হবে না। বাবুজি, এ কবচখানা সর্বদাই যেন আপনার গলায় থাকে।

—তাতে আমার কী উপকার হবে ?

—উপকার কী হবে জানি না, তবে অপকার কিছু হবে না। এ হচ্ছে রক্ষাকবচ। এ কবচ গলায় থাকলে কোনও অপদেবতা আপনার কিছুই অনিষ্ট করতে পারবে না।

আমি বললুম, এখানকার আর সকলের মতো আপনিও বুঝি অপদেবতার ভয় করছেন? কিন্তু জেনে রাখুন, আমি নিজে অপদেবতাকে ভয় করি না, এমনকি অপদেবতার অস্তিত্বও স্বীকার করি না।

বৃদ্ধা মিনতিভরা কণ্ঠে বললেন, বাবুজি, আপনি অপদেবতা মানুন আর নাইই মানুন, এই কবচখানা গলায় পরে থাকতে ক্ষতি কী? বুড়ির এই কথাটি কি আপনি রাখবেন না?

আমি আর 'না' বলতে পারলুম না। কবচখানা পরতে অস্বীকার করলে এই স্নেহময়ী প্রাচীনা নিশ্চয়ই প্রাণের ভিতরে আঘাত পাবেন।

বৃদ্ধা রেশমি সুতোয় বাঁধা একখানি তামার কবচ আমার গলায় বুলিয়ে দিলেন। আমিও তাঁর পাওনা-গণ্ডা। চুকিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

সরাইখানার বাইরে গিয়ে দেখি, চারিদিকের অন্ধকার হয়ে উঠেছে আরও ঘন, আরও নিরেট-তা ভেদ করে দুই হাত দূরেও নজর চলে না। দুই হাতের ভিতরেও যা দেখা যায়, তাও হচ্ছে। আবছায়ার মতো।

হঠাৎ সরাইখানার দরজার ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কে আমার কানে কানে বললে, বাবু, রাত বারোটার সময় বিশেষ সাবধানে থাকবেন। বনের যত ভয়, জেগে ওঠে। ওই সময়েই।

রাস্তার উপর থেকে খনখনে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে একজন সকৌতুকে হেসে উঠল। ভালো করে। তাকিয়ে দেখি, সামনেই রয়েছে একখানা টোঙগাড়ি, আর তার ঘোড়ার মুখের লাগাম ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা দীর্ঘ মূর্তি।

সবই দেখা গেল ভাসা-ভাসা, ঝাপসা। কিন্তু হাসল যে ওই মূর্তিটাই, সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। মূর্তি এবার দুই পা এগিয়ে এসে বললে, 'বিনয়বাবু, ওই লোকটা আপনাকে এমন চুপিচুপি সাবধান হতে বললে যে, এতদূর থেকেও আমি তার কথা শুনতে পেয়েছি।

বিস্মিত হলুম। কারণ যে আমাকে সাবধান করে দিলে, সত্যসত্যই সে এত চুপিচুপি কথা হয়েছিল যে, কারুর পক্ষে অতদূর থেকে তা শুনতে পাওয়া সম্ভবপর নয়। তবু সে কথা যদি ওই লোকটি শুনতে পেয়ে থাকে, তাহলে তার শোনবার শক্তি য়ে অত্যন্ত অসাধারণ, এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। তার উপরে আর এক কথা। এই অন্ধকারে ওই মূর্তি আমাকে চিনলে কেমন করে? আমার নাম পর্যন্ত ওর অজানা নয়। তবে উনিই কি রাজাবাহাদুর স্বয়ং?

সুটকেসটা নিয়ে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই রাজার সেই কর্মচারী একখানা দৃঢ় হস্তে আমার বাঁ হাতখানা চেপে ধরে আমাকে গাড়ির উপরে উঠতে সাহায্য করলেন। তাঁর মুষ্টির দৃঢ়তা দেখেই বুঝতে পারলুম, লোকটি হচ্ছে অসাধারণ ক্ষমতাশালী। আমার মতন লোককে সে হয়তো শিশুর মতো অনায়াসেই দশ-পনেরো হাত দূরে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে।

তিন নীল আলো এবং মৃত্যুর দূত

গাড়ি বেগে ছুটেছে বনের পথ দিয়ে। তার দুটো লণ্ঠনের আলোকশিখায় পথের দুইদিকেই দেখতে পাচ্ছি শুধু নানা জাতের গাছের পর গাছ, আর জঙ্গলের পর জঙ্গল। পৃথিবীর সমস্তই যেন একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে—গাছের পাতারা, বন্য বাতাস বা কোনও জীবজন্তুই কিছুমাত্র শব্দের সৃষ্টি করছে না—কেবল শুকনো পাথুরে পথের উপর জেগে জেগে উঠছে এই গাড়ির তেজি ঘোড়াটার অশ্রান্ত পায়ের শব্দ। গাড়ির চালক রাজার সেই কর্মচারীই।

মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে বনজঙ্গল, এবং তার বদলে দেখা যাচ্ছে এক-একটা মস্ত মাঠের তিমিরাচ্ছন্ন শূন্যতা। আবার কোথাও বা গাড়ি চলছে উঁচু নিচু পাহাড়ে পথের উপর দিয়ে এবং সেখানে এপাশে-ওপাশে দেখা যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে অন্ধকারেরও চেয়ে কলো কালিতে আঁকা ছোটো-বড়ো পাহাড়ের শিখর। এ-রকম বন্ধুর পথের উপর দিয়ে কোনও সাধারণ টোঙগাড়ি যে এত বেগে আর এমন অনায়াসে অগ্রসর হতে পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। অবাক হয়ে সেই কথাই ভাবতে লাগলুম।

ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখে এসেছিল তন্দ্রা তা আমি বুঝতে পারিনি। খানিক পরে কী এক অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ আমার তন্দ্রা গেল ছুটে। ভালো করে উঠে বসে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে দেখি, আমার হাতঘড়িতে বেজেছে তখন ঠিক রাত বারোটা। সমানে ছুটে চলেছে গাড়ি।

বনের কোথা থেকে একটা কুকুর সুদীর্ঘ স্বরে কেঁদে উঠল। সে আতঙ্কগ্রস্ত কণ্ঠস্বরে জাগছে। যেন একটা অত্যন্ত যন্ত্রণার ভাব। সে কান্না শেষ হতে-না-হতেই আবার আর-একটা কুকুর জুড়ে দিলে ঠিক সেই রকমই আতঙ্কগ্রস্ত ক্রন্দন। এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই আর-একটার পর আর-একটা আবার তারপর আর-একটাচা◌েএমনি অনেকগুলো কুকুরই সমস্বরে

চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিলে। বন্য কুকুরদের সেই অদ্ভুত কান্নার ঐকতান ভেসে ভেসে আসতে লাগল যেন পাহাড়ের উপর দিয়ে, অরণ্যের ভিতর দিয়ে, এমনকি অন্ধকারের অন্তঃপুর ভেদ করে।

গাড়ির ঘোড়টাও চমকে চমকে উঠে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়বার চেষ্টা করলে। কিন্তু চালকের আশ্বাসবাণী শুনে সে যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হল। তারপর, পাহাড়ের ভিতরে দুধার থেকেই সমস্বরে জেগে উঠল আর এক সুতীক্ষ্ণ ও উচ্চতর চিৎকার। একসঙ্গে চিৎকার করছে অনেকগুলো নেকড়ে বাঘ।

গাড়ির ঘোড়াটা বিষম চমকে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং আমারও ইচ্ছা হল, এইবেলা গাড়ির ভিতর থেকে লাফিয়ে পড়ে যেদিক থেকে এসেছি আবার সেইদিকেই দৌড় মারি। সরাইখানায় যতক্ষণ ছিলুম, ততক্ষণই শুনেছি কেবল আতঙ্ক আর অমঙ্গল আর ভূতপ্রেতের কথা। বিশ্বাস করি আর না-করি, সেইসব জল্পনা-কল্পনা আমার অজ্ঞাতসারেই এখন যে মনের ভিতরে কাজ করছে, এটুকু বেশ বুঝতে পারলুম। সরাই ত্যাগ করবার অল্প আগে বৃদ্ধার মুখে শুনেছি, তার ছেলে রাত্রে এই বনের ভিতরেই হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। দরজার কাছে কে আবার বলে দিলে, রাত বারোটার সময় সাবধানে থাকতে। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অন্তরের মধ্যে জগতে লাগল। কেবল এইসব কথাই। নেকড়েগুলো সেই রকমই চিৎকার করছে বটে, তবে, চালকের আশ্বাসবাণী শুনে ঘোড়াটা আবার ছুটতে আরম্ভ করলে—কিন্তু আর তেমন জোরে নয়, এবং ভয়ে ভায়ে।

আচম্বিতে দেখলুম। আর এক অদ্ভুত দৃশ্য। খানিক তফাতে জঙ্গলের ভিতরে জ্বলছে একটা আশ্চর্য নীল রঙের আলো। সে আলোটা অত্যন্ত তীব্র

বটে, কিন্তু তবু তার আভায় বনের আশপাশকার অন্ধকারের নিবিড়তা কিছুমাত্র কমে যাচ্ছে না। নীল আলো জ্বলছে, কিন্তু নিজের বাইরে এতটুকু আলো বিকীর্ণ করছে না।

চালকও আলোটা দেখলে। তখনই সে গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে পড়ল এবং এগিয়ে চলল সেইদিকে। আর-একটা ব্যাপার যা লক্ষ করলুম, নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। চালকের মূর্তি ঠিক আমার আর আলোকের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। এমন অবস্থায় আলোটা তার দেহের দ্বারা আকৃত হয়ে যাবারই কথা; কিন্তু দেহটাকে না ঢেকে সেই অস্বাভাবিক নীল আলোটা তার দেহ ভেদ করেই আমার চোখের সামনে জেগে রইল সমানভাবেই। এও কি সম্ভব? যে দেহ ফুটে এমনভাবে আলো বেরুতে পারে, সে কী রকম দেহ? রক্ত-মাংসে গড়া কোনও দেহই এমন স্বচ্ছ হতে পারে না।

আমি কি আবার ঘুমিয়ে পড়েছি? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছি? কিংবা জেগে থেকেও আমার চোখ ভুল দেখছে?

বেশিদূর পর্যন্ত চোখ চলে না, তবু মনে হল, গাড়ি থেকে কিছুদূরে আমার দুই পাশে আর সামনের দিকে অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যেন অত্যন্ত সন্দেহজনক কতকগুলো জীবন্ত দেহ! থেকে থেকে সেখান থেকেও দপ-দপ করে জ্বলে উঠছে যেন কতগুলো ক্ষুধিত ও নিষ্ঠুর দৃষ্টি!

টর্চটা তুলে নিয়ে এদিকে-ওদিকে ও সামনের দিকে নিক্ষেপ করলুম সমুজ্জ্বল আলোক-শিখা। কী ভয়ানক! মাটির উপরে সামনের দুই থাবা পেতে বসে আছে দলে দলে নেকড়ে বাঘ—চক্ষে তাদের জ্বলন্ত হিংসা, এবং প্রত্যেকেরই মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ছে টকটকে লাল ও লকলকে জিহবা। সভয়ে কাঁপতে কাঁপতে গাড়ির পিছন দিকেও একবার আলোক-

শিখা সঞ্চালন করে দেখলুম, সেখানেও বসে আছে আরও কতগুলো নেকড়ে বাঘ। সর্বনাশ, নেকড়ের দল যে

খুশি হবার জন্যেই এখানে এসে হাজির হয়নি, যে-কোনও মুহূর্তেই তারা তিরের মতো ছুটে এসে আক্রমণ করে আমাদের দেহ করে ফেলতে পারে ছিন্নবিচ্ছিন্ন!

চালক তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই অপার্থিব নীল আলোটার কাছে। সেখানে সে যে কী করছে তা সেইই জানে, কিন্তু তার ভাব দেখলে মনে হয়, হয়তো সে নিজের বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, এত কাছে এসেছে যে দলে দলে সাক্ষাৎ মৃত্যুর দূত, এটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না সে। আর্তস্বরে চেঁচিয়ে আমি তাকে ডাকালুম।

চালক আবার গাড়ির দিকে পায়ে পায়ে ফিরে আসতে লাগল। প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগল, এই বুঝি নেকড়েগুলো লাফ মেরে চালকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার দেহকে করে দেয় খণ্ডবিখণ্ড! নেকড়েগুলো গাড়ির চারিদিক বেষ্টন করে মণ্ডলাকারে বসে রয়েছে, চালক কি তা দেখতে পাচ্ছে না? কেমন করে হিংস্র পশুদের এই বৃহ ভেদ করে গাড়ির কাছে সে আসবে?

কিন্তু আশ্চর্য, আশ্চর্য চালক যেন নিজের মনেই বিড় বিড় করে কী বললে এবং কয়েকবার দিলে হাততালি। তারপর সে খুব সহজভাবেই সোজা গাড়ির কাছে এসে আবার নিজের আসনে উঠে বসিল, সম্পূর্ণ নির্বিকারভাবে।

অতটা ভয় ও বিস্ময়ের মধ্যেও আমি দমন করতে পারলুম না। আমার কৌতূহল। তাড়াতাড়ি আবার টর্চটা জ্বেলে চারিধারে নিক্ষেপ করলুম আলোক-শিখা।

যে জন্যেই হোক, নিশ্চয় আজ আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, কারণ কোনওদিকে তাকিয়ে আমি আর দেখতে পেলুম না একটামাত্র নেকড়ে বাঘকে!

রাজা রুদ্রপ্রতাপ

শেষ রাত।

পূর্বাচলে ধরণীর ললাটে তখনও জাগেনি প্রভাতের জ্যোতির্ময় আশীর্বাদ। অন্ধকার একটুখানি পাতলা হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু তখনও ঘোচেনি দৃষ্টির অন্ধতা।

বোধহয় আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম, কারণ টোঙা যে কখন বিশালগড়ের সিংহদ্বারের মধ্যে প্রবেশ করে তার বিপুল আঙিনার প্রান্তে এসে থেমে দাঁড়িয়েছে, সেটা আমি একটুও টের পাইনি। গাড়ি থামতেই ছুটে গেল আমার তন্দ্রা।

স্পষ্ট তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না, ঝাপসা ঝাপসা যেটুকু দেখা গেল মনে হল, আমরা এক প্রকাণ্ড অট্টালিকার সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। আকাশের গায়ে যে কালিমালিপ্ত অট্টালিকার বহিঃরেখা আঁকা রয়েছে তা যেমন উচ্চ, তেমনই প্রশস্ত।

সেইদিকে তাকিয়ে আছি, হঠাৎ টোঙাচালক আমার উপর-হাতটা চেপে ধরে বললে, ‘এইবার আপনাকে নামতে হবে।’ তখন যেমন করেছিলুম, এখনও তেমনই অনুভব করলুম, চালকের হস্তে আছে অসুরের মতন শক্তি। সে একটু জোরে চাপ দিলেই হয়তো গুড়ো হয়ে যেতে পারে আমার হাতের হাড়!

নীচে নেমে সে দাঁড়াল। তারপর ঘোড়ার মুখ ধরে গাড়ি নিয়ে এগিয়ে হারিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে কোথায়, কে জানে। উঃ! চারিদিক কী স্তব্ধ! একটা কীটপতঙ্গেরও সাড়া নেই। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে সেই অপরিসীম স্তব্ধতা যেন বিরাট একখানা জগদল পাথরের মতন পোষণ করবার চেষ্টা করছে আমার হৃদয়-মানকে।

এমন প্রকাণ্ড অট্টালিকা, অথচ কোথাও নেই একটিমাত্র আলো বা একটিমাত্র মানুষ। প্রায় পনেরো মিনিটকাল ধরে চিন্তা এসে আমার মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললে। এ আমি কোথায়, কার কাছে এসে পড়লুম? আরম্ভেই যেটুকু পরিচয় পেয়েছি, তা মোটেই সন্তোষজনক নয়। রহস্যময় গাড়ির চালক ও রহস্যময় নীল আলো! তারপর সেই সাঙ্ঘাতিক নেকড়েগুলো! তারা আমাকে আক্রমণ করতে এসে চালককে দেখে নিঃশব্দে আবার অদৃশ্য হল কেন? নেকড়ের মতন হিংস্র পশুদের উপরে কোনও মানুষের যে এমন প্রভাব থাকতে পারে, মন এ কথা বিশ্বাস করতে চায় না। তারপর যাঁর বাড়িতে আজ আমি এসেছি, সেই রাজাবাহাদুরই বা কী রকম মানুষ? সরাইখানার লোকগুলি যে কেউ রাজাবাহাদুর সম্বন্ধে ভালো ধারণা পোষণ করে, এমন তো মনে হল না। বরং তারা নানাভাবে, নানা ইঙ্গিতে আমাকে এখানে আসতেই নিষেধ করেছে বারংবার।

এইসব ভাবছি, হঠাৎ হড়-হড় করে একটা শব্দ হল, এবং সেই শব্দ শুনে কেবল আমি নয়, এখানকার সমস্ত অন্ধকার ও স্তব্ধতাও যেন চমকে জাগ্রত হয়ে উঠল। তারপর সামনের দিকে সুবৃহৎ একটা দ্বারপথের ভারী ভারী পাল্লা দু-খানা খুলে গেল ধীরে ধীরে। একটা লণ্ঠনের উজ্জ্বল আলোকরেখা দরজার ভিতর থেকে বেরিয়ে একেবারে আমার মুখের উপর এসে পড়ল।

ভালো করে চেয়ে দেখি, দ্বারপথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক দীর্ঘদেহ বৃদ্ধ। তাঁর মুখের মধ্যে সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে একজোড়া লম্বা গোঁফ। কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো লম্বা গোঁফের দুই প্রান্ত ওষ্ঠধরের দুই পাশ দিয়ে চিবুকের তলা পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পরনে তাঁর ঘন কৃষ্ণবর্ণের কোর্তা ও পায়জামা। ডান হাত তুলে পরিষ্কার কণ্ঠে তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, 'আসুন বিনয়বাবু, আজ আপনি আমার অতিথি হয়েছেন। বাড়ির ভিতরে আসুন। আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে বৃদ্ধা আর এক পদও অগ্রসর হলেন না, সেইখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ঠিক একটা পাথরের মূর্তির মতো।

বাড়িয়ে এত জোরে আমার সঙ্গে করমর্দন করলেন যে আমার হাতের আঙুলগুলো যেন ভেঙে যাবার মতো হল। কোনও বৃদ্ধের হাতে এমন শক্তি থাকতে পারে, আমার পক্ষে এটা ছিল একেবারেই অভাবিত। কেবল তাই নয়, বৃদ্ধের হাত যেন কনকনে তুষারের মতো ঠান্ডা, আমার হাতের উপর রয়েছে যেন কোনও মৃতদেহের হাত!

বৃদ্ধা আবার বললেন, স্বাগত, স্বাগত! স্বেচ্ছায় আমার বাড়ির ভিতরে আসুন! আবার নিরাপদে যখন ফিরে যাবেন তখন যে আনন্দ আপনি সঙ্গে করে এনেছেন, তার খানিকটা যেন এখানে রেখে যেতে ভুলবেন না।

তখনও আমি নিজেকে ঠিক সামলে নিতে পারিনি। বৃদ্ধের বাহুর শক্তি আমাকে মনে করিয়ে দিলে সেই টোঙাচালকের বাহুর শক্তিকে। অন্ধকারে সেই চালকের মুখ একবারও আমি দেখতে পাইনি। আমার সন্দেহ হতে লাগল যে, হয়তো সেইটোঙার চালক আর এই বৃদ্ধা দু-জনেই অভিন্ন। তাই সন্দেহ-ভঞ্জনের জন্যে কিঞ্চিৎ দ্বিধাভরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ?

—হ্যাঁ, আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি। বিনয়বাবু, আমি আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ করছি। রাত্রে পথে আসতে নিশ্চয়ই আপনার খুব কষ্ট হয়েছে। আসুন, আগে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে নিন।

যদিও শেষ-রাত্রে সেই জলযোগের প্রস্তাবটা একটু অদ্ভুত শোনাল, তবু আমি কোনও প্রতিবাদ করলুম না।

রাজা হেঁট হয়ে পড়ে আমার সুটকেসটা মাটির উপর হতে নিজেই তুলে নিতে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিতে গেলুম, কিন্তু তিনি কোনও মানা না মেনেই আমার সুটকেসটা তুলে নিয়ে বললেন, না বিনয়বাবু, আপনি আমার অতিথি। বাড়ির লোকজনেরা কেউ এখন জেগে নেই, কাজেই আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। আসুন।

দ্বারপথ পার হয়ে খানিক গিয়েই পেলুম এক সোপানশ্রেণী। দ্বিতলে উঠে একটা দালানের উপরে এসে পড়লুম, তার মেঝেটা মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো।

দালানের একপ্রান্তে এসে রাজা ঠেলে একটা দরজা খুলে দিলেন। ভিতরে ঢুকে দেখলুম, প্রকাণ্ড ঘর, একটা ঝাড়লণ্ঠনের আলোকে সমস্ত ঘরখানাই আলোকিত। মাঝখানে টেবিল ঘিরে খানকয়েক চেয়ার, এবং টেবিলের উপরে সাজানো রয়েছে কয়েক রকম খাবারের থালা। রাজা ঘরের এক কোণে আমার সুটকেসটা রেখে দিয়ে আর এক দিকের আর একটা দরজা ঠেলে খুললেন। তারপর ইঙ্গিতে আমাকে সেই ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে বললেন।

ঘরে ঢুকে আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। একদিকে রয়েছে প্রকাণ্ড একখানি পালঙ্ক, তার উপরে ধবধবে সাদা চাদরে মোড়া বিছানা

পাতা। খাদ্য দেখে আমার মন কিছুমাত্র লুব্ধ হয়নি, কিন্তু রাত্রের অত কষ্টের পর এই কোমল শয্যা দেখে আমার ইচ্ছে হতে লাগল, এখনই ছুটে গিয়ে সেখানে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি।

রাজা বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। কারণ তিনি বললেন, 'বিনয়বাবু, দেখছি আপনি বড়েই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আজ আর কোনও কথা নয়। এখন আপনি খেয়ে-দোয়ে শুয়ে পড়ুন। আপনার যা কিছু দরকার এই ঘরেই খুঁজে পাবেন। কাল সকালে একটু কাজে আমায় বাইরে যেতে হবে। সন্ধ্যার চায়ের আসরে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে।' এই বলে তিনি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তিনটে অদ্ভুত স্বপ্ন

পরদিন সকালবেলা। রাজাবাহাদুরকে দেখতে পেলুম না এবং সকালের চা নিয়েও কেউ এল না। কিন্তু দুপুরে পাশের ঘরে টেবিলের উপরে পেলুম অন্যান্য আহার্য। তবে আশ্চর্য এই সব খাবার ঠান্ডা। কোনও মানুষের সাড়াও শুনলুম না। কালকের অনিদ্রার ঘোর এখনও যায়নি। তাই এসব নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে আবার শুয়ে পড়লুম এবং সেই ঘুম যখন ভাঙল তখন সূর্য গিয়েছে অস্তে।

তাড়াতাড়ি গাত্রোত্থান করে মুখ হাত ধুয়ে জামা কাপড় পরছি, এমন সময় ঘরের দরজার ওপাশে শোনা গেল রাজার কণ্ঠস্বর, বিনয়বাবু, আপনার দিবানিদ্রা ভেঙেছে কি? এদিকে চা আর খাবার প্রস্তুত।

দরজা খুলে বাহিরে বেরুতেই রাজা আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে প্রবেশ করলেন। মাঝখানে টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে দামি দামি

চায়ের সরঞ্জাম এবং টোস্ট, ডিম ও অন্যান্য খাদ্য। আমি বললুম, রাজাবাহাদুর চারের সঙ্গে এত খাবার খাওয়ার অভ্যাস আমার নেই। এ করেছেন কী?

রাজা বললেন, এ নির্জন বনের ভিতরে এর বেশি আর কিছু আয়োজন করতে পারা যায় না। শহরে থাকলে আপনাকে এর চেয়ে ঢের বেশি খাবার খেতে হত। নিন, এখন আসন গ্রহণ করুন।

টেবিলের একধারে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বসে পড়লুম, রাজা বসলেন গিয়ে অন্য প্রান্তে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, বিনয়বাবু, আমি আগেই চা আর খাবার খেয়ে নিয়েছি, কাজেই এখন আপনাকে একলাই খেতে আর চা পান করতে হবে।

খাবার খেতে খেতে রাজাবাহাদুরকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলুম। তাঁর মুখ দেখলেই বোঝা যায়, তিনি একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক। তাঁর মাথার চুলগুলি পেকে সাদা ধবধবে হয়েছে। তাঁর ভ্রূর উপরেও খুব পুরু চুলের গোছা। সুদীর্ঘ নাসিকা। লম্বা ও মস্ত গোঁফজোড়ার মাঝখানে তার ওষ্ঠাধর দেখলে তাকে একজন নির্দয় লোক বলেই মনে হয়। ওষ্ঠ্যাধরের ফাকে, যে দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে অসাধারণ তাদের তীক্ষ্ণতা।

রাজা কাল যখন আমার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন, তখনই আমি আরও দু-একটা আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ করেছিলুম। তাঁর দুই হাতের তালুর মাঝখানে আছে এক গোছা চুল, এবং তাঁর আঙুলের নখগুলোও যেন অস্বাভাবিক ধারালো। কেবল তাই নয়, আমার নাকেও এমন একটা বিশ্রী ঘ্রাণ এসে লেগেছিল, যে আর একটু হলেই আমি বমন করে ফেলতুম। যদিও সেটা অসম্ভব, তবু আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন কোনও গলিত মাংসের দুর্গন্ধ

পাচ্ছি। আমার মুখের ভাব দেখে রাজা তখন তাড়াতাড়ি দূরে সরে গিয়েছিলেন।

চা পান করতে করতে রাজার কাছে আমি ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই পুরোনো ও ভাঙা বাগানবাড়িটার কথা তুললুম। রাজা নীরবে সমস্ত কথা শ্রবণ করলেন। আমার বক্তব্য শেষ হবার পর তিনি খুশি মুখে বললেন, ধন্যবাদ বিনয়বাবু, ধন্যবাদ। আমি ঠিক যে রকম বাড়ি আর জমি চাই আপনি আজ তারই সন্ধান দিলেন। দেখুন, আমি সেকেলে মানুষ। তার উপরে শহরের বিলাসিতা আর আধুনিকতা ছেড়ে আমি বনের ভিতরে সাদাসিধে জীবন যাপন করতে চাই। আমার এই বিশালগড় দেখছেন? কতকাল আগে আমার পূর্বপুরুষরা এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা আর এই গড় তৈরি করে গিয়েছেন; কত যুদ্ধবিগ্রহের স্মৃতি এই বিশালগড়ের প্রত্যেক পাথরের গায়ে মাখানো আছে, অতীতের কত ঐশ্বর্য আগে একে অপূর্ব করে রেখেছিল, আজ আমরা সে সব কল্পনাতেও আনতে পারব না। আজ আমাদের সে গর্ব, ঐশ্বর্য আর সমৃদ্ধি নেই বটে, কিন্তু আজও আমার দেহের ভিতরে, ধমনীতে ধমনীতে রক্তধারার সঙ্গে জীবন্ত হয়ে আছে আমাদের সেই প্রাচীন বংশগৌরব। সেইজন্যেই এই ভাঙা আর পুরোনো বিশালগড়কে আজও আমি ভুলতে পারিনি। আর এইখানে থেকে থেকে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, পরম আধুনিক প্রকাণ্ড কোনও রাজপ্রাসাদ পেলেও তার ভিতরে গিয়ে বাস করবার প্রবৃত্তি আমার হবে না। তাই একেলে শহর কলকাতাতে গিয়েও কোনও অট্টালিকায় বাস করবার ইচ্ছা আমার নেই। বংশে আমি প্রাচীন, মনে আমি প্রাচীন আর বয়সেও আমি প্রাচীন, তাই তো আমি কিনতে চেয়েছি প্রাচীন কোনও বাগানবাড়ি। সুতরাং আমার এই অদ্ভুত

রুচি দেখে আপনারা কেউ বিস্মিত হবেন না, এমন আশা আমি করতে পারি।

আমি বললুম, যেচে কেউ যে পুরোনো বাড়ি কিনতে চায় এটা আমরা জানতুম না। কাজেই আমরা বিস্মিত হয়েছিলুম বইকি। কিন্তু এতক্ষণ পরে আপনার কথা শুনে সে রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন্তু আর একটি কথা জানতে আমার আগ্রহ হয়েছে। আপনি বোধহয় বাঙালি নন?

রাজাবাহাদুর বললেন, না, জাতে আমরা রাজপুত।

—কিন্তু আপনি এত ভালো বাংলা শিখলেন কী করে? বাংলাদেশে গিয়ে কখনও থেকেছিলেন কি?

রাজা মৃদু হেসে বললেন, না। কিন্তু খালি বাংলা কেন, ভারতবর্ষের আরও অনেক দেশের ভাষাই আমি জানি। ওপাশের ঘরে আমার লাইব্রেরিতে গেলে দেখবেন, সেখানে অন্তত হাজারদুই বাংলা বই আছে। বাংলা দেশ সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা, আমি ওই সব বই পড়েই অর্জন করেছি। এমনকি আপনাদের কলকাতায় কোথায় কোন রাস্তা আছে, আর কোন কোন রাস্তায় কে কে বিখ্যাত ব্যক্তি বাস করেন, সে খবরও আমার নখদর্পণে।

—বই পড়তে আমি বড়োই ভালোবাসি, পড়বার ইচ্ছে হলে আমি কি আপনার লাইব্রেরিতে যেতে পারি?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়! এই বিশালগড়ের যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন; কিন্তু দরজা যেখানে বন্ধ দেখবেন সেখানে কোনওদিন ঢোকবার চেষ্টা না করলেই আমি খুশি হব। কারণ এই বিশালগড় আপনাদের কলকাতা শহরের কোনও অট্টালিকা নয়। এখানে এমন অনেক কিছুই

আছে, যার অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। সেইজন্য আগে থাকতেই আপনাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত মনে করছি।

হঠাৎ আমার মনে পড়ল কালকের রাত্রের রহস্যময় ঘটনাগুলোর কথা। তাই নিয়েই রাজার কাছে আমি কোনও কোনও প্রশ্ন তুললুম। তিনি কোনও প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং কখনও নিরুত্তর হয়ে রইলেন।

তখন তাঁর কাছে সেই নীল আলোর প্রসঙ্গ তুললুম। তিনি বললেন, আপনি তো শুনেছেন, এখানকার লোকেরা বিশ্বাস করে যে কোনও কোনও নির্দিষ্ট রাত্রে-যেমন, অমাবস্যার শনিবারের রাত্রে-এ অঞ্চলের গভীর অরণ্যে প্রেতাত্মাদের আবির্ভাব হয়। সেই সময়ে যেখানে দেখা যায় নীল রঙের একটা অদ্ভুত আলো সেইখানেই মাটি খুঁড়লে পাওয়া যায় গুপ্তধন। আমার কর্মচারী বোধহয় গুপ্তধনের লোভেই সেই নীল আলোর কাছে গিয়েছিল।

আমার চা পান শেষ হল। রাজাও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, বিনয়বাবু, আপনাদের অফিসে আমি এখনই খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি যে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়ি আমার পছন্দ হয়েছে। আপনি কলকাতায় যাবার আগেই আমি এখান থেকেই ও-বাড়িখানা কেনবার জন্যে আমার একজন প্রতিনিধি কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।' এই বলে তিনি ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা-দুই পরে কামাবার আরশিখানা বার করে টেবিলের উপরে রেখে একমনে দাড়ির উপর ক্ষুর চালনা করছি, হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার কাঁধের উপর একখানা হাত রেখে বললে, অসুবিধা হচ্ছে না তো?

এই সম্ভাষণের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না, চমকে উঠতে ক্ষুর লেগে আমার চিবুক গেল কেটে। ফিরে দেখি, আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাদুর। বিস্মিত হলুম। কারণ আরশির ভিতর দিয়ে আমার পিছন

দিক ও দরজার কাছটা দেখা যাচ্ছিল বেশ স্পষ্ট। অথচ রাজা যে কখন ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছেন আমি তা একটুও দেখতে পাইনি। সন্দেহ দূর করবার জন্যে আর-একবার আরশির দিকে ফিরে ভালো বরে তাকিয়ে দেখলুম। কিন্তু কী আশ্চর্য, রাজা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমার ঠিক পিছনেই, অথচ দর্পণের মধ্যে নেই তাঁর মূর্তির ছায়া। এ কী অসম্ভব ব্যাপার! এদেশে এসে পর্যন্ত যেসব অভাবিত কথা শুনছি। আর যেসব অপার্থিব দৃশ্য দর্শন করছি, তার কোনওটারই অর্থ আমি বুঝতে পারিনি। আজ এখনই যা দেখলুম, তাও কি সেইরকমই কোনও আজগুবি ব্যাপার? মানুষ আছে, দর্পণে নেই মানুষের দেহের ছায়া?

কিন্তু তখন এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারলুম না, কারণ আমার চিবুকের ক্ষত থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছিল।

স্টিকিং প্লাস্টার বার করবার জন্যে সুটকেসের দিকে অগ্রসর হচ্ছি, এমন সময় রাজাও আমার চিবুকের অবস্থাটা দেখতে পেলেন। পরমুহূর্তেই তাঁর মুখের ভাব বদলে গেল অসম্ভব রূপে। মনে হল, আমার সামনে দেখছি যেন একটা রক্তলোভী হিংস্র জন্তুর ভয়াবহ মুখ-তার মধ্যে নেই কিছুমাত্র মানবতার চিহ্ন! রাজা আচম্বিতে বাঘের মতন আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে চেপে ধরলেন আমার দুই স্কন্ধাদেশ। তাঁর বিকৃত মুখখানা এগিয়ে এল আমার মুখের খুব কাছে এবং তার পরেই তার চোখ পড়ল আমার গলায় ঝোলানো কবচখানার দিকে। দেখতে দেখতে তাঁর মুখখানা আবার শান্ত হয়ে এল। অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে তিনি বললেন, বিনয়বাবু, সাবধানে থাকবেন। আমার বাড়িতে রক্তপাত করা নিরাপদ নয়!

তারপর হঠাৎ সামনের দিকে হেঁট হয়ে পড়ে আরশিখানা তুলে নিয়ে সক্রোধে তিনি বললেন, এই আরশিই হচ্ছে সর্বনাশের জিনিস! মানুষ

নিজের আমিত্বকে বড়ো করে দেখবার জন্যে সৃষ্টি করেছে এই আরশি! চুলোয় যাক,—চুলোয় যাক!' বলতে বলতে জানলার ধারে গিয়ে আরশিখানা তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাইরের দিকে। তারপর আর কোনও কথা না বলেই হন-হন করে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। কী থেকে কী যে হল আর কেন যে হল, তার কোনও হদিশ খুঁজে পেলুম না। পরে-পরে মনের ভিতরে জাগল তিনটে অদ্ভুত প্রশ্ন। আরশিতে রাজার ছায়া পড়ল না কেন? আমার চিবুকের রক্ত দেখে রাজার মুখের ভাব অমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল কেন? আর আরশি দেখে তার অতটা রাগের কারণই বা কী?

রাত্রির সন্তান

আমি বন্দি। হ্যাঁ, এ বিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ নেই। আজকে জানতে পেরেছি। এই ভয়াবহ সত্য কথাটা। কেমন খেয়াল হল দোতলা থেকে নেমে প্রকাণ্ড সদর দরজাটার কাছে গেলুম। ইচ্ছা! ছিল একবার বেরিয়ে বাইরের চারিদিকটা ঘুরে আমি। কিন্তু দরজার পাল্লা টানতে গিয়ে দেখি বাহিরের থেকে সেটা বন্ধ।

তখন ভিতরে ফিরে এসে একতালার চারিদিক অন্বেষণ করতে লাগলুম, বাইরে বেরুবার যদি আর কোনও দরজা থাকে। লম্বায় চওড়ায় প্রায় দুশো ফুট ব্যাপী প্রকাণ্ড চতুষ্কোণ উঠোন, তার চারিধারে প্রশস্ত দরদালান এবং তার পর সারি সারি ঘরের পর ঘর। কিন্তু প্রত্যেক ঘরের দরজাতেই বড়ো-বড়ো কুলুপ লাগানো এবং কোনও দিকেই জনপ্রাণীর

সাড়া নেই। সেখানকার অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মনে হল, আমি যেন কোনও অভিশপ্ত, পরিত্যক্ত হানাবাড়ির ভিতরে এসে পড়েছি।

প্রাঙ্গণের আর-একদিক দিয়ে আর-একটি পথ আছে। এবং সেই পথের শেষেও আর একটা বন্ধ দরজা। খুব সম্ভব এটা হচ্ছে। এ মহল থেকে অন্য মহলে যাবার পথ, কারণ সেখানকার রাজারাজড়াদের প্রাসাদে বা কোনও ধনী ব্যক্তির অট্টালিকায় তিন-চারটির কম মহল থাকত না। এখানকার অন্য মহলে কী আছে তা জানিবার কোনওই উপায় নেই, কেননা ওদিকে যাবার যে একটিমাত্র দ্বার, তাও ওপাশ থেকে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

আবার উপরে লাইব্রেরি-ঘরে ফিরে এসে বসলুম। এমনভাবে নিজেকে বন্দি বলে বুঝে মনটা বড়োই খারাপ হয়ে গেল। দুই-তিনখানা কেতাব নিয়ে নাড়াচাড়া করলুম, পড়তে ভালো লাগল না। উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

নীচেই দেখা যাচ্ছে বিশালগড়ের বিস্তৃত অঙ্গন। এক সময়ে অঙ্গনের সমস্তটাই যে পাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল, দেখলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু এখন অধিকাংশ প্রস্তরখণ্ডই স্থানচ্যুত বাচুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। সেইসব শৈবাল-চিত্রিত শিলাখণ্ড দেখলেই বুঝতে বিলম্ব হয় না, যে তাদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু শতাব্দীর ঝড় ও বৃষ্টি। অঙ্গনের যে-সব জায়গার পাথর সরে গিয়েছে, সে-সব স্থান বন্য লতাগুল্ম ও ঝোপঝাপের দ্বারা সমাবৃত।

অঙ্গনের পরে বিশালগড়ের সু-উচ্চ এবং সুদীর্ঘ প্রস্তর-প্রাচীর। ভূমিতল থেকে তার উচ্চতা ৫০ ফুটের কম নয়। এই প্রাচীর লঙ্ঘন করে কোনও মানুষের পক্ষেই ভিতর থেকে বাহির বা বাহির থেকে ভিতরে আসা

সম্ভবপর নয়। প্রাচীরের ওপাশে দেখা যাচ্ছে পাহাড়ের পর পাহাড় এবং কোথাও বা সুদূর বনের সুনীল রেখা এবং তার উপরে নত হয়ে পড়েছে সূর্যের অস্তরাগরেখায় বিচিত্র নীলাকাশ। বাহির থেকে ভেসে আসছে স্বাধীন বিহঙ্গদের কলকাকলি। তাদের সেই মুক্ত প্রাণের সঙ্গীত শুনে আমার প্রাণে জাগল দীর্ঘশ্বাস। স্বাধীন, তারা স্বাধীন—কিন্তু আমি? বন্দি!

নীচের সদর দরজা খোলার শব্দ পেলুম। গবাক্ষ দিয়ে হেঁট হয়ে দেখি, রাজা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করছেন।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলুম। ছয়-সাত মিনিট কেটে গেল, রাজা। তবু আমার কাছে এলেন না। কৌতূহলী হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। দেখলুম, আমার শোবার ঘরের দরজাটা আধখানা খোলা রয়েছে। আলতো পায়ে এগিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে সবিস্ময়ে দেখলুম, আমার জন্যে রাজা করছেন, স্বহস্তে শয্যারচনা। নিঃশব্দে আবার ফিরে এলুম লাইব্রেরি-ঘরে। তাহলে আমি মনে মনে যে সন্দেহ করেছিলুম তা মিথ্যা নয়? এই বিশাল অট্টালিকায় রাজা একাকী বাস করেন। এমনকি, আমার জন্যে তাঁকে আহার্য আর শয্যা পর্যন্ত প্রস্তুত করতে হয়!

এখানে যখন রাজা আর আমি ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব নেই, তখন টোঙার যে চালক সরাই থেকে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিল, সে-ও তাহলে রাজা ছাড়া আর কেউ নয়। এতক্ষণ পরে আমার মনে পড়ল, অন্ধকারে আমি টোঙাচালকের মুখ একবারও দেখতে পাইনি, নিশ্চয় রাজা ইচ্ছে করেই গ্রহণ করেছিলেন অন্ধকারের সেই সুযোগ।

দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল আমার সমস্ত হৃদয়-মন। সেই ভয়াবহ টোঙাচালক, যার দেহ ভেদ করে ওপাশের আলো দেখা যায়, যার একটিমাত্র

নীরব ইঙ্গিতে ক্ষুধিত নেকড়ে বাঘের দল শিকার ছেড়ে অদৃশ্য হয় এবং যার দুই বাহুতে আছে ভীমের মতন অসাধারণ শক্তি!

সরাইখানায় যা শুনেছিলুম, আবার সেইসব কথা একে-একে মনে পড়তে লাগল। তারা সকলেই একবাক্যে আমাকে এখানে আসতে মানা করেছিল। অনেকে শরীরী প্রেতের কথা বলে। আমাকে ভয় দেখাতেও ছাড়েনি। আর সেই পুত্রহারা বৃদ্ধা, যে রক্ষাকবচ ঝুলিয়ে দিয়েছিল আমার কণ্ঠদেশে, তার কথা ভেবে আমার সমস্ত অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার অবিশ্বাসী মন তখন এই কবচের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে পারেনি, কিন্তু এখন এই কবচখানা যে আমার গলায় ঝুলছে, এটা ভেবেও আমি অনেকটা আশ্বস্ত হতে পারলুম।

এর পর আমার কী করা উচিত? আমার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, রাজাকে জানতে না দেওয়া যে আমি তার কোনও গুপ্ত কথা আবিষ্কার করতে পেরেছি। রাজা যে ইচ্ছা করেই আমাকে এখানে বন্দি করে রাখতে চান, এটা বেশ ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু নিজেকে আমি যে বন্দি বলে জেনেছি, এই ভাবটা কিছুতেই তার কাছে প্রকাশ করা হবে না। আমার দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, সর্বদাই দৃষ্টিকে সজাগ রাখা এবং রাজা কী করছেন না করছেন পদে পদে সেইদিকে লক্ষ রাখা। জনশূন্য বিশালগড়ে আমি বন্দি; এখন একমাত্র নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করা ছাড়া আমার মুক্তিলাভের আর কোনও উপায় নেই।

রাজা এই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। তাঁর পরনে সেই ঘনকৃষ্ণ পরিচ্ছদ। আজ নতুন চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলুম, রাজার বর্ণ গৌর বটে, কিন্তু তার হাত ও মুখের শুভ্রতার ভিতরে রক্ত-আভার কোনওরকম

আভাস নেই। বহুক্ষণ-মৃত মানুষের মতন তাঁর দেহের বর্ণ হচ্ছে পাণ্ডুর। কালো পোশাকের ভিতরে সেই পাণ্ডুরতা আরও বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাজা এসেই বললেন, বিনয়বাবু, আপনাদের ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই বাড়িখানা কেনবার জন্যে আমার প্রতিনিধি। আজকেই কলকাতায় যাত্রা করেছেন।

আমি বললুম, রাজাবাহাদুর, তাহলে আমার কর্তব্য তো শেষ হয়েছে, আমিও তো এখন অনায়াসেই কলকাতায় চলে যেতে পারি?

এত শীঘ্র?

—আমি স্বাধীন নই, অপরের কর্মচারী মাত্র। বলে এসেছি, তিন-চার দিনের বেশি এখানে থকিব না। যথাসময়ে কলকাতায় না ফিরলে আমার উপরওয়ালা অসন্তুষ্ট হতে পারেন।

রাজা মাথা নেড়ে বললেন, না না বিনয়বাবু, তা হতেই পারে না। আপনাকে আমার ভালো লেগেছে। এত শীঘ্র আপনাকে ছাড়া হবে না। আরও কিছুদিন আমার আতিথ্য স্বীকার করতেই হবে।

নাচারভাবে বললুম, বেশ, তাহলে আর উপায় কী?

হঠাৎ আমার দিকে দৃষ্টি স্থির করে গভীরভাবে ও কঠিন স্বরে রাজা বললেন, আর একটা কথা আপনাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই। আপনাকে যে-কয়টি ঘর ব্যবহার করতে দিয়েছি, তা ছাড়া আর কোনও ঘরেই আপনি যেন ঢোকবার চেষ্টা না করেন। এই প্রাসাদ হচ্ছে অনেক কালের পুরোনো, এর মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে বহু কালের বহু প্রাচীন স্মৃতি। অনেক স্মৃতিই সুখের নয়; তারা আনন্দ দেয় না, ভয় দেখায়। নিজের সীমা অতিক্রম করলে আপনাকে রীতিমতো বিপদগ্রস্ত হতে হবে। আর

সেইসব বিপদ এমন কল্পনাতীত যে-- বলতে বলতে হঠাৎ তিনি থেমে গেলেন এবং উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনতে লাগলেন।

আমিও শোনবার চেষ্টা করলুম। জানলা দিয়ে দেখলুম, বাহিরের সমস্ত দৃশ্য লুপ্ত করে নেমে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধ যবনিকা। চারিদিক স্তব্ধ, পাখিরাও নীরব। কিন্তু সেই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে দূর থেকে ভেসে ভেসে আসছে এমন এক রোমাঞ্চকর ধ্বনি, যা হিম করে দেয় বুকের রক্ত! তা হচ্ছে একদল নেকড়ে বাঘের গর্জন।

রাজার দুই চক্ষু যেন জ্বলে উঠল উৎকট আনন্দে। ধীরে ধীরে তিনি বললেন, শুনুন, শুনুন! রাত্রির সন্তানদের কণ্ঠস্বর শুনুন! আহা, তারা রচনা করছে কী মধুর সঙ্গীত!

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম, কোনও কথাই বলতে পারলুম না।

রাজা অল্প একটু হেসে বললেন, 'ও, বুঝেছি। আপনারা হচ্ছেন শহুরে জীব, শিকারির বন্য আনন্দ অনুভব করবার শক্তি আপনাদের নেই।' বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন দ্রুতপদে।

আমি যেন তলিয়ে গেলুম বিস্ময়-সাগরে। হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল সন্দেহে এবং আতঙ্কে। এমন সব অপার্থিব কথা আমি ভাবতে লাগলুম, বাইরে যা প্রকাশ করা অসম্ভব। ভগবান আমাকে রক্ষা করুন!

ত্রিমূর্তি

খানিকক্ষণ আচ্ছন্নের মতো সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখন আমার এমন অবস্থা, যে ভালো মন্দ কোনওরকম চিন্তা করবার শক্তিই

আমার ছিল না। মিনিট কয়েক পরে ধীরে ধীরে কেটে গেল আমার সেই আচ্ছন্ন ভাবটা। বাড়ির ভিতরে রাজার কোনও সাড়াশব্দ না পেয়ে আস্তে আস্তে দোতলার দালানে গিয়ে দাঁড়ালুম। প্রশস্ত সোপানশ্রেণী দোতলা থেকে আরও উপরে উঠে গিয়েছে। আনমনার মতো সেই সোপান ধরে আমিও উঠতে লাগলুম উপরদিকে। দোতলার পর তেতলা পার হয়ে পেলুম মস্ত বড়ো একটা খোলা ছাদ। ছাদের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। নিজেকে বন্দি জেনে এবং সঙ্কীর্ণ ঘরের ভিতরে বন্ধ হয়ে এতক্ষণ আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠেছিল, এখন মুক্ত আকাশের তলায় এসে দাঁড়িয়ে মনের ভিতরে জাগল একটা পরম আশ্বস্তি।

সেদিন ছিল প্রতিপদের রাত্রি। সুন্দর আরেঅকে চারিদিক ঝকঝক করছে প্রায় দিনের বেলার মতো। রুপোলি কিরণধারায় দূরের পাহাড়গুলো যেন বিগলিত হয়ে যাচ্ছে। বনে বনে আর উপত্যকায় দুলছে আলোছায়ার বিচিত্র দোলা। ওই পাহাড়ে যে বিচরণ করে সজাগ মৃত্যুদূতরা, সে কথা ভুলিয়ে দেয়। আজকের এই প্রকৃতির জ্যোতির্ময় সৌন্দর্য। তাকিয়ে রইলুম বিমুগ্ধ হয়ে। আচম্বিতে তেতলার একটা গবাক্ষের দিকে আমার দৃষ্টি হল আকৃষ্ট। সেখানে গবাক্ষের তলা থেকে ভূমিতল পর্যন্ত বাড়ির যে জীর্ণ অংশটা ছিল তার নানাস্থানেই দেওয়ালের পাথরগুলো দেওয়াল থেকে অল্প-সল্প বেরিয়ে বেরিয়ে এসেছে। গবাক্ষের ভিতর থেকে বাহিরে এল আস্তে আস্তে একটি কালো পোশাক পরা মানুষের মূর্তি। এত উঁচু থেকে তার মুখ দেখতে না পেয়েও আমার বুঝতে বিলম্ব হল না যে সে মুখ রাজার ছাড়া আর কারুর নয়।

তারপরে সভয়ে দেখলুম এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। নীচের দিকে মুখ এবং উপর দিকে পা করে রাজা দেওয়ালের গা বেয়ে ধীরে ধীরে নেমে

যেতে লাগলেন মস্ত একটা সরীসৃপের মতন! প্রথমটা ভাবলুম আমারই বুঝি দেখবার ভুল হয়েছে। তারপর ভালো করে দেখলুম, রাজা, হাতের আঙুল-এবং যেন পায়ের আঙুলগুলোও-দিয়ে সেই দেওয়াল থেকে বেরিয়ে-পড়া পাথরের ধার চেপে ধরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছেন। তাঁর ঝালকালে কালো পোশাক দেহের দুই দিকে ছড়িয়ে থাকাতে তাকে মনে হচ্ছিল যেন প্রকাণ্ড একটা বাদুড়ের মতো।

ভগবান জানেন, এই রাজা কোন জাতীয় জীব! এঁকে মানুষের মতন দেখতে বটে, কিন্তু ইনি কি মানুষ? বাড়িতে সিঁড়ি থাকতেও কোনও মানুষ কি এমন করে দেওয়াল বেয়ে মাটিতে গিয়ে নামতে চায়?

কী ভয়ানক জায়গাতেই আমি এসে পড়েছি! দেখছি আমার আর উদ্ধার নেই! গবাক্ষ থেকে প্রায় একশো ফুট নীচে আছে পৃথিবীর দৃশ্য। মাটিতে নামবার পর রাজার মূর্তি আর দেখতে পেলুম না। হয়তো একটা গর্ত বা অন্য কোনও কিছুর ভিতরে ঢুকে তিনি একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন।

রাজা বাড়ির ভিতর নেই জেনে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে তেতালার দালানে নেমে এলুম। সেখানে রয়েছে ঘরের পর ঘর। টর্চটা আমার সঙ্গেই ছিল। টর্চের আলো ফেলে ঘরের দরজাগুলো পরীক্ষা করতে লাগলুম। প্রত্যেক দরজাতেই রয়েছে এক-একটা বড়ো কুলুপ। দরজাগুলো পুরাতন বটে, কিন্তু কুলুপগুলো নতুন। যেন সবে কিনে এনে লাগানো হয়েছে। দরজার পর দরজার উপরে দৃষ্টি চালনা করতে করতে সেই সুদীর্ঘ দালানের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পেরিয়ে গেলুম। সেখানে দুটো ছোটো ছোটো কুঠরির দরজা ছিল খোলা, কিন্তু ভিতরে ঢুকে কেবল ধুলো আর আবর্জনা আর দু-চারটে ভাঙাচোরা সেকেলে আসবাব ছাড়া আর কিছুই দেখতে

পেলুম না। বোধহয় এ দুটো হচ্ছে পরিত্যক্ত ঘর। তারপরেই আর একটা দরজা এবং বাহির থেকে কেবলমাত্র শিকল তুলে সে-দরজাটা বন্ধ করা আছে। শিকল খুলে ঘরে প্রবেশ করলুম। মস্ত ঘর-হলের মতো বড়ো। একপাশে সার-গাঁথা জানলাগুলোর ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকে সমস্ত ঘরখানাকে অনেকটা স্পষ্ট করে তুলেছে। একটা জানলা দিয়ে বাইরে দৃষ্টিচালনা করে দেখলুম, বিশালগড়ের প্রকারের এক পাশে অদূরেই রয়েছে একটা উপত্যক। তারপরেই অনেকগুলো পাহাড়ের পর পাহাড় আর শিখরের পর শিখর ক্রমেই আকাশের দিকে উঁচু হয়ে উঠে গিয়েছে।

ঘরের ভিতরটা পরীক্ষা করতে লাগলুম। এ ঘরটা খুব বেশি পরিষ্কার না হলেও এখানে ধুলো-জঞ্জালের কোনওই বাড়াবাড়ি নেই। কয়েকখানা সোফা, কৌচ, চেয়ার, লেখবার টেবিল ও সাজপোশাক পরিবার টেবিল প্রভৃতি আসবাবও রয়েছে। কিন্তু কোনও আসবাবই একালের উপযোগী নয়। তবে, এইটুকু কেবল অনুমান করতে পারলুম, খুব সম্ভব এটা হচ্ছে কোনও স্ত্রীলোকের ঘর। সেকালে বোধহয় রাজবাড়ির কোনও নারী এই ঘরটা ব্যবহার করতেন।

মনের ভিতরে জাগল কেমন শ্রান্তির ভাব। শরীর যেন এলিয়ে পড়তে চাইলে। একটা সোফার উপরে ঝুপ করে বসে পড়লুম। তারপর সেই আধা-আলো ও আধা-অন্ধকারে আমার চোখের উপরে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল তন্দ্রার আমেজ। একটা অসীম স্তব্ধতাকে বুকের ভিতরে অনুভব করতে করতে বোধহয় আমি ঘুমিয়েই পড়লুম। রাজা যে আমাকে বলেছিলেন আমার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরের বাহিরে অন্য কোথাও গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, একথা আমার একবারও মনে পড়ল না। এবং মনে

পড়লেও হয়তো আমি তাঁর হুকুম মানতুম না। তাঁর অবাধ্য হওয়াও এখন আমার কাছে বিশেষ একটা আনন্দের মতো।

খানিকক্ষণ পরে মনে হল, ঘরে আমি আর একলা নই। আমি স্বপ্নলোকে বিচরণ করছিলুম। কি না জানি না, কিন্তু চোখ খুলেই দেখলুম চন্দ্রলোকে সমুজ্জ্বল ঘরের একটা অংশ। সেইখানে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তিনজন সুন্দরী তরুণী। আশ্চর্য এই, তারা চাঁদের আলোর দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে ছিল বটে, তবু মূর্তিগুলোর সামনের দিকে মেঝের উপরে নেই কারুর দেহের ছায়া।

যেমন সঙ্গীতের ধ্বনি জাগে, তাদেরও হাসির ধ্বনি হচ্ছে সেইরকমই সুমধুর। একটি মেয়ে বললে, 'দিদি, এগিয়ে যা! প্রথমে তোরই পালা!' আর-একজন বললে, 'লোকটার বয়স দেখছি কাঁচা। নিশ্চয় এর রক্তও খুব তাজা' এই অদ্ভুত উক্তি শুনে আমার বুকটা ছাৎ করে উঠল। কিন্তু কী যেন মোহিনী-মন্ত্রে অভিভূত হয়ে আমি একটুও নড়তে, উঠে বসতে বা দাঁড়িয়ে উঠতে পারলুম না। অত্যন্ত অসহায়ের মতো বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখলুম, একটি তরুণী এগিয়ে এসে আমার সোফার পাশে হাঁটু গেড়ে মাটির উপরে বসে পড়ল। ধীরে ধীরে তার মুখ আমার দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগল এবং তার দুই চক্ষে জাগল একটা উৎকট ও ক্ষুধিত আনন্দের দীপ্তি। তারপরেই আমার কণ্ঠদেশে অনুভব করলুম। দুটো ধারালো দাঁতের দংশন।

কিন্তু আমার গলার উপরে তার দাঁত দুটো ভালো করে চেপে বসতে না বসতেই ঘরের ভিতরে আবির্ভূত হল আর একটি সুদীর্ঘ মূর্তি। দেখেই চিনলুম। স্বয়ং রাজা রুদ্রপ্রতাপ।

রাজার চোখদুটো জ্বলছে জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের মতো। সে চক্ষের দীপ্তি যেন ভয়ানক নরকাগ্নির মতন। যে তরুণী আমার কণ্ঠের উপরে দংশন করেছে, রাজার একখানা বলবান হাত বেগে গলা চেপে ধরে এক টানে তাকে দাঁড় করিয়ে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলে।

ভীষণ ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, কোন সাহসে তোরা এর কাছে এসেছিস? কোন সাহসে তোরা এর উপরে নজর দিয়েছিস-আমি কি তোদের মানা করিনি ? চলে যা, চলে যা এখান থেকে ! এ লোকটার উপরে আমি ছাড়া আর কারুর অধিকার নেই!

তিন তরুণী আনন্দহীন তীক্ষ্ণ হাস্যধ্বনিতে সমস্ত ঘরখানা পরিপূর্ণ করে তুললে। সে কী অলৌকিক হাসি, আমার প্রাণ যেন হৃদয়ের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়তে চাইল। একটি তরুণী বললে, আমাদের উপরে তোমার কোনও দয়া নেই!

রাজা খুব মনোযোগের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করলেন আমার মুখের উপরে। তারপর ফিরে সহজভাবে সন্ত্বনাভরা মৃদু কণ্ঠস্বরে বললেন, তোদের উপরে যে আমার দয়া আছে, এ কথা কি তোরা জানিস না? আচ্ছা, এ লোকটাকে নিয়ে আগে আমার কাজ শেষ হোক, তারপর একে সঁপে দেব তোদের হাতে। এখন যা যা, চলে যা! আমাকে এখন একে জাগাতে হবে!

আর-একজন তরুণী বললে, আজ কি তাহলে আমাদের উপবাস?

—না, কে তোদের উপবাস করতে বলছে? এই নে। বলেই তিনি একটা পোটলা মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। পোটলাটা মাটির উপরে পড়েই নড়ে-নড়ে উঠল—যেন তার ভিতরে আছে জীবন্ত কোনও-কিছু।

একটা স্ত্রীলোক পোটলাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘিনীর মতন মহা আগ্রহে তারপর পোটলাটা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে শুনতে

পেলুম একটা হাঁপিয়ে-ওঠা চাপা গলার কান্নার শব্দ। কেঁদে উঠল যেন কোনও কচি শিশু। তারপরেই নিদারুণ ভয়ে স্তম্ভিতের মতন দেখলুম, সেই ভয়ানক পোটলাটা নিয়ে স্ত্রীলোক তিনটে একসঙ্গে ছুটে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল। কেমন করে বেরিয়ে গেল আমি জানি না, কারণ যেখান দিয়ে তারা অদৃশ্য হল, সেখানে দরজা বা গবাক্ষ কিছুই ছিল না। তারা মিশিয়ে গেল যেন চাঁদের আলোর সঙ্গে। তারপরেই জানলার ভিতর দিয়ে ঘরের বাইরে তাকিয়ে দেখলুম, শূন্যের মধ্যে ভেসে যাচ্ছে যেন তিনটে জীবন্ত ছায়া।

আমি একেবারে অজ্ঞান হয়ে গেলুম।

নেকড়ের খোরাক

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখি, শুয়ে আছি নিজের বিছানায়। কেমন করে আমি এখানে এলুম? রাজা কি নিজেই আমাকে বহন করে এনেছেন? ভাবতে ভাবতে উঠে পড়লুম। রোদের, সোনামাখা আলো এসে পড়েছে। ঘরের ভিতরে। সকালের স্নিগ্ধ বাতাসের স্পর্শ পেয়ে কালকের রাত্রের ঘটনাগুলো মনে হতে লাগল মিথ্যা স্বপ্ন বলে। তারপরেই বোধ হল, আমার গলার এক জায়গা যেন জ্বালা করছে। সেখানে হাত দিয়েই বুঝলুম, আমার গলায় রয়েছে একটা ক্ষত। সামান্য ক্ষত বটে, কিন্তু কাল রাত্রে এইখানেই তো পেয়েছিলুম সর্বনেশে স্ত্রীলোকটার দাঁতের স্পর্শ বেশ বোঝা যাচ্ছে, কাল রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখিনি। স্বপ্নের ক্ষত কখনও জাগরণে থাকে না। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল আমার সর্বাঙ্গ। কাল রাত্রে আমি কাদের পাল্লায় গিয়ে পড়েছিলুম? তবে কি তারা প্রেতিনী? চলতি কথায় যাদের বলে পেতনি?

প্রেতিনী এত সুন্দরী হয়? রাজাকে দেখতে তো মানুষের মতো, প্রেতিনী কি মানুষের মতো; প্রেতিনী কি মানুষের হুকুম তামিল করে? আর এই অদ্ভুত রাজাই কি প্রেতিনীদের খোরাক জোগান।

ভীষণ, ভীষণ। এই চিন্তা! আজ থেকে আর আমি রাজার অবাধ্য হব না, সন্ধ্যার পর আর কোনওদিন নিজের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করব না! আবার অন্য ঘরে গেলে আর বোধহয় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারব না। আমার পক্ষে এই ঘরই হচ্ছে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

সেদিন দুপুরে বাইরের অঙ্গন থেকে কয়েকজন লোকের গলার সাড়া পাওয়া গেল। জানলার ধারে গিয়ে দেখি, সেখানে বসে বা দাঁড়িয়ে আছে কয়েক জন লোক। পোশাক দেখে তাদের বেদে বলেই মনে হল।

ভাবলুম, আচ্ছা এদের সাহায্যে আমার অবস্থার কথা লিখে কলকাতায় লুকিয়ে চিঠি পাঠালে কেমন হয়? এই কথা মনে হতেই ছুটে টেবিলের ধারে গিয়ে বসলুম। এবং তাড়াতাড়ি কয়েকটা লাইন লিখে কাগজখানা খামে মুড়ে তার উপরে দিলুম। আমার অফিসের ঠিকানা। তারপর সেই খামের সঙ্গে একখানা দশ টাকার নোট একগাছা সুতো দিয়ে বেঁধে আবার জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমি হাত নেড়ে ইঙ্গিত করতেই একজন যুবক বেদে আমার জানলার ঠিক তলায় এসে উপস্থিত হল।

যতটা সম্ভব নিচু গলায় তাকে বললুম, এই চিঠিখানা যদি ডাকঘরে দেবার ব্যবস্থা করতে পারো, তাহলে দশ টাকা বিকশিশ পাবে।

লোকটা আমাকে সেলাম করে হাসিমুখে মাথা নেড়ে জানালে, আমার কথামতো কাজ করতে সে নারাজ নয়।

নোটের সঙ্গে চিঠিখানা নীচের দিকে ফেলে দিলুম, লোকটা আর-একবার সেলাম ঠুকে হনহন করে সেখান থেকে অদৃশ্য হল।

সন্ধ্যাবেলায় রাজা আমার ঘরে এসে হাজির। তিনি আমার পাশে এসে বসলেন এবং অত্যন্ত শান্ত, মিষ্ট স্বরে বললেন, একজন বেদে এই চিঠিখানা আমার হাতে দিয়ে গেল।

আমার বুকের ভিতরটা কঁপতে লাগল, কিন্তু মুখে কোনও কথা বললুম না। রাজা একটুখানি হাসলেন। তারপর পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে একটি কাঠি জেলে চিঠিখানা তার শিখার উপরে তুলে ধরলেন। দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল চিঠিখানা।

আর একটিমাত্র বাক্য উচ্চারণ না করে রাজা ধীর পদে বেরিয়ে গেলেন ঘরের বাইরে। হতাশভাবে বসে রইলুম। ওই বেদেগুলো যে রাজারই লোক সেটা বেশ ভালো করেই বোঝা গেল। চিঠিখানা যে রাজা পড়ে দেখেছেন সে বিষয়েও কোনও সন্দেহ নেই। ব্যর্থ হল আমার মুক্তির চেষ্টা।

জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলুম দুঃখিতভাবে।

বাইরে চন্দ্রলোকের মহা সমারোহ। বন থেকে ভেসে আসছে গানের পাখির কণ্ঠস্বর। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য আজ আমার মন গ্রহণ করতে পারলে না।

আমার দৃষ্টি দেখছিল আর একটা দৃশ্য। চন্দ্রকিরণের স্থানে স্থানে উড়ে বেড়াচ্ছে যেন অনেকগুলো অতি-শুভ্র ধুলোর কণা এবং মণ্ডলাকারে উড়তে উড়তে জায়গায় জায়গায়, তারা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। দৃশ্যটা দেখতে আমার চোখে ভালোই লাগল।

হঠাৎ উপত্যকার দিক থেকে একদল কুকুরের কেঁউ-কেঁউ করে আর্তস্বরে কান্না জেগে উঠল। এবং আমার দেহের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল কেমন একটা চমৎকার শিহরণ। কুকুরের কান্না ক্রমশই জোরালো হয়ে উঠছে এবং সেই ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই চন্দ্রালোকে উত্তপ্ত ধূলিপুঞ্জগুলো যেন নূতন নূতন আকার গ্রহণ করতে লাগল। আমার মনে হল, কে যেন কোথা থেকে আমাকে ডাকছে, ডাকছে, আর ডাকছে! সেই অজানার ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য আমার কেমন একটা আগ্রহ হতে লাগল। কানে কানে ও প্রাণে প্রাণে শুনলুম ও অনুভব করলুম। সে কী এক অদ্ভুত সম্মোহন-মন্ত্র।

শূন্যে ধূলিপুঞ্জের নৃত্য হয়ে উঠল দ্রুততর। তারা বেগে সঞ্চালিত হতে লাগল এপাশেওপাশে, উপরে ও নীচে। চন্দ্রলোকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল কীসের একটি কম্পন। তারপরে ক্রমে-ক্রমে সেই ধূলির পুঞ্জগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে কী রকম সব আকার লাভ করতে লাগল! তারপর দেখলুম যেন চাঁদের আলো দিয়ে তৈরি তিনটে নারীর মূর্তি। কাল রাত্রে যাদের আমি ও-ঘরের ভিতরে স্বচক্ষে দেখেছিলুম, তারা ছাড়া এরা আর কেউ নয়।

রাজা কাল বলেছিলেন, পরে তাদেরই হাতে আমাকে তিনি সমর্পণ করবেন। এরা কি আজ তারই জন্যে আমাকে আবার দাবি করতে এসেছে? সভয়ে তাড়াতাড়ি দুমদাম শব্দে ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে দিলুম। আমার কাছে এই অন্ধকার ঘরই নিরাপদ, এখানে নেই বাইরের বিপজ্জনক চন্দ্রলোক! জানিলা বন্ধ করে অনেকটা নিশ্চিন্ত হলুম।

ঘণ্টা-দুই কেটে গেল। আমার ঘরের ঠিক উপরেই ছিল রাজাবাহাদুরের শয়নগৃহ। মনে হল, সেইখানেই চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল যেন এক কিশোর কণ্ঠস্বর। তারপর হঠাৎ কণ্ঠ রুদ্ধ হলে যেমন হয়, তেমনিভাবেই থেমে গেল শিশুর সেই ক্রন্দন। আমার বুকের কাছটা ধড়ফড় করতে লাগল। তাড়াতাড়ি উঠে ঘর থেকে বেরুতে গেলুম, কিন্তু ঘরের দরজা বাহির থেকে বন্ধ। হতাশভাবে নিজের বিছানায় এসে বসলুম। কী কর্তব্য, তাই চিন্তা করতে লাগলুম।

তারপরে বাড়ির বাইরে নীচের দিক থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আবার কেঁদে উঠল। কোন এক নারীর কণ্ঠ। আবার উঠে। ছুটে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি একটা জানলা খুলে দিলুম। মুখ বাড়িয়ে দেখি জানলার ঠিক নীচেই অঙ্গনের উপরে জানু পেতে বসে আছে উদভ্রান্তের মতো এক নারীমূর্তি। তার এলানো চুলগুলো বিশৃঙ্খলভাবে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়েছে এবং দুই হাত দিয়ে এমনভাবে সে নিজের বুকখানাকে চেপে ধরেছে যে দেখলেই বোঝা যায়, অনেক দূর থেকে সে ছুটিতে ছুটতে এখানে এসে পড়ে নিজের হাঁপ সামলাবার চেষ্টা করছে।

জানলায় আমার মুখ দেখে সে সামনের দিকে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তারপর তীব্র স্বরে চিৎকার

সে আবার জানু পেতে বসল ও দুই হাত উর্ধ্বে তুলে এমনভাবে আবার সেই কথাগুলো উচ্চারণ করলে যে, নিদারুণ দুঃখে বুকটা যেন আমার ভেঙে গেল। তারপর কঁদতে কঁদতে কখনও সে মাটির উপরে আছড়ে-পিছড়ে পড়তে ও কখনও দুই হাতে বুক চাপড়াতে ও কখনও নিজের মাথার চুলগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। সে এক মর্মন্তুদ দৃশ্য!

বোধহয় উপরের ঘর থেকেই শুনতে পেলুম রাজার কর্কশ কণ্ঠস্বর। তিনি যা বলছিলেন, তার একটা বর্ণও বোঝা গেল না। কারণ সে যেন কতকগুলো অর্থহীন অদ্ভুত ধ্বনি ছাড়া আর কিছুই নয়। সঙ্গে-সঙ্গে এদিক ওদিক ও সুদূর থেকে আকাশ-বাতাসকে যেন বিষাক্ত করে তুললে দলেদলে নেকড়ে বাঘের বুভুক্ষু গর্জনের পর গর্জন। রাজা কি তবে তাদেরই আহ্বান করেছেন? মানুষের পক্ষে দূর্বোধি রাজার এই অর্থহীন ধ্বনির অর্থ কি তাহলে নেকড়েদের কাছে সুস্পষ্ট? রাজা কি নেকড়েদের ভাষাও জানেন? আমার সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মূর্তিমান ঝড়ের মতো বেগে একদল নেকড়ে বাঘ রাজার অঙ্গনের ভিতরে এসে অভাগী নারীমূর্তিটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নারীর কণ্ঠ থেকে আর কোনও শব্দ শোনা গেল না, নেকড়েদেরও গর্জন হল স্তব্ধ। খানিক পরে তারা একে-একে লকলকে জিভ দিয়ে নিজেদের মুখ চাটতে চাটতে অঙ্গনের ভিতর থেকে আবার বেরিয়ে গেল।

মনে মনে বললুম, মৃত্যুই শ্রেয়, অভাগীর মৃত্যুই শ্রেয়! তার শিশুর কী পরিণাম হয়েছে, তা আমি জানি। এর পরও বেঁচে আর লাভ নেই।

কিন্তু আমি কী করব, আমি কী করতে পারি? কেমন করে আমি এই ভয়াল রাজা এবং ভীষণ আতঙ্ক এবং অন্ধকার রাত্রির কবল থেকে নিস্তার লাভ করব? ভাবতে ভাবতে শ্রান্ত হয়ে কখন ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন আকাশের কোলে খেলা করছে আনন্দময়ী তরুণী উষা।

রাত্রে যে আমার মতন যম-যন্ত্রণা ভোগ করে, তার কাছে ভোরের আলো যে কতখানি মিষ্টি, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউই তা বুঝতে পারবে না। বিশালগড়ের উচ্চ তোরণের ঠিক উপরেই আকাশপথে দেখা দিলে

গৌরবময় প্রভাতসূর্য। তাকে দেখেই আমার সমস্ত ভয় সর্বাঙ্গ থেকে খসে পড়ল বিষধরের খোলসের মতো। এইবার আমাকে নামতে হবে কার্যক্ষেত্রে। যা কিছু করবার, দিনের আলো থাকতে থাকতেই সব শেষ করে ফেলতে হবে। উঠে দাঁড়লুম। সামনের আনলাটার দিকে নজর গেল। সেটা একেবারেই খালি। সেখানে আমার যত জামা-কাপড় ও চাদর সাজানো ছিল, সমস্তই অদৃশ্য হয়েছে। তারপর ফিরে তাকিয়ে দেখি, আমার 'পোর্টম্যান্টো'টা পর্যন্ত আর ঘরের ভিতরে নেই।

এ কীর্তি যে রাজার, তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি এখন কী করব? আমি যে একেবারে রিক্ত? আমার পরনে আছে কেবল একখানা আধা-ময়লা কাপড় আর একটি মাত্র গেঞ্জি। আমার পায়ের তিন জোড়া জুতো পর্যন্ত খুঁজে পেলুম না। এমন বেশে, এমন নগ্নপদে আমি যে বাড়ির বাহিরে যেতে পারব না, নিশ্চয় তাই বুঝেই রাজা এই ব্যবস্থা করেছেন।

রাজার দেহ

কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কেবল রাত্রিবেলাতেই আমি হই নানান আতঙ্কের দ্বারা আক্রান্ত। রাত্রেই আমার জন্যে যেন অপেক্ষা করে রকম-রকম বিপদ-আপদ। আর একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই আজ পর্যন্ত দিনের বেলায় সূর্যাস্তের আগে একদিনও আমি রাজার দেখা পাইনি। এর হেতু কী? পৃথিবী যখন জাগে, উনি কি তখন ঘুমোন, আর পৃথিবী যখন ঘুমোয়, তখনই কি তিনি ওঠেন। জেগে?

আজ সকালে দেখছি, আমার ঘরের দরজাটা বাহির থেকে আবার খুলে দেওয়া হয়েছে। খালি পায়ে আর প্রায় অর্ধনগ্ন দেহে আমি যে এই বিশালগড় ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করব না, এইটুকু আন্দাজ করেই রাজা বোধহয় নিশ্চিন্ত হয়েছেন আমার সম্বন্ধে।

কিন্তু এই বাড়ির ভিতরে চলাফেরায় আমার যখন বাধা নেই, তখন দিনের বেলায় এখানকার রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করলে কেমন হয়? খুব সম্ভব সমস্ত রহস্যের মূল তথ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে রাজার ওই তিনতলার শয়নগৃহে প্রবেশ করলে। কিন্তু কেমন করে সেখানে যাব? দেখছি সে-ঘরের দরজা সর্বদাই তালাবন্ধ থাকে।

হঠাৎ একটা কথা মনে হল। আচ্ছা, রাজা নিজের ঘরের গবাক্ষের ভিতর দিয়ে যেভাবে নীচে নেমে আসেন। সেইভাবেই কি কেউ বাহির থেকে দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারে না? আমি নিজের চোখে তাকে ওখান থেকে নামতে দেখেছি, চেষ্টা করলে আমিই বা কেন ওই পথ দিয়ে উপরে উঠতে পারব না? অবশ্য পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু আসুক বিপদ, আমি এখন মরিয়া। এখানে আর কিছুদিন থাকলেও যখন বাঁচব না, তখন বাঁচবার চেষ্টা করেও যদি মরতে হয়, তবে সেটা হবে মন্দের ভালো। বেশ, দেখা যাক। ভগবান আমাকে সাহায্য করবেন।

জানলার কাছে গিয়ে হেঁট হয়ে দেখলুম, আমার ঘরের গবাক্ষের ঠিক নীচে দিয়ে বাড়ির এদিক আর ওদিকে চলে গিয়েছে দোতলার সুদীর্ঘ কানিশটা। সেকলকার বড়ো-বড়ো বাড়ির কার্নিশ এমন চওড়া হত যে একটু চেষ্টা করলেই তার উপর দিয়ে অনায়াসেই পদচালনা করতে পারা যেত। রাজার তিনতলার ঘর থেকে জীর্ণ দেওয়ালের যে ধার-বার-করা পাথরগুলো একতলা পর্যন্ত নেমে গিয়েছে, আমার এই গবাক্ষ থেকে দেওয়ালের সেই

অংশটার দূরত্ব মাত্র কয়েক হাত। সুতরাং ওখানে গিয়ে পৌঁছতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না বলেই মনে করি।

গবাক্ষ দিয়ে বেরিয়ে কার্নিশের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। বুকটা একবার কেঁপে উঠল, কারণ এই সেকেলে বাড়ির অতি পুরাতন কার্নিশ আমার ভারে যদি হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে, তাহলে বিদায় আমার পৃথিবী, বিদায় আমার বাঁচবার আশা!

নীচের দিকে তাকালুম না—হয়তো ভূমিতলের দূরত্ব দেখে মাথা ঘুরে যেতে পারে। দেওয়ালের সঙ্গে গা মিশিয়ে পায়ে পায়ে রাজার ঘরের নীচেকার এবড়ো-খেবড়ো পাথরগুলোর কাছে নিরাপদে গিয়ে পৌঁছলুম। তারপর দুই হাত আর দুই পায়ের সাহায্যে সেই ধার-বার-করা পাথরগুলো অবলম্বন করে সাবধানে ধীরে ধীরে উপর দিকে উঠতে লাগলুম।

এই তো সেই গবাক্ষ, যার ভিতর থেকে বেরিয়ে রাজা সেদিন নীচের দিকে নেমে গিয়েছিলেন। ঘরের ভিতরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই বুকটা আমার দুরদুর করে উঠল। কিন্তু তারপর ভালো করে তাকিয়ে দেখে বুঝলুম, ঘরের ভিতরে জনপ্রাণী নেই। জানলার উপরে হাত চাপড়ে কয়েকবার শব্দ করলুম, ভিতর থেকে তবু কারুর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বিশেষ বিস্মিত হলুম। রাজা তাহলে দিনের বেলাতেও ঘরের বাইরে যান? কিন্তু দিনের বেলায় তাঁর সঙ্গে আমার কোনওদিন দেখা হয়নি কেন? আমার সামনে আভির্ভুত হয়েছেন তিনি কেবল নিশাচর রূপেই।

কতকটা আশ্বস্ত হয়ে গবাক্ষ-পথ দিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে নামলুম। গৃহতল মর্মর-মণ্ডিত বটে, কিন্তু ধুলোর প্রলেপে ও যত্নের অভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে মর্মরের তাজা শুভ্রতা। সেই প্রশস্ত ঘরের চারিদিকেই রয়েছে হরেক

রকম আসবাব। প্রত্যেক আসবাবই অত্যন্ত গুরুভার ও বহুকাল আগেকার। এসব আসবাব যে ব্যবহৃত হয়, এমন কোনও প্রমাণও পেলুম না।

এক জায়গায় রয়েছে মস্ত-বড়ো একটা সেকেলে টেবিল। তার উপরে স্তূপীকৃত হয়ে আছে অনেক রকম স্বর্ণমুদ্রা। সেই স্বর্ণ স্তূপের উপরেও জমে উঠেছে প্রায় আধা ইঞ্চি পুরু ধুলোর স্তর। বোঝা গেল সেসব মুদ্রাও অনেক কাল স্পর্শ করা হয়নি। মুদ্রগুলো পরীক্ষা করলুম। কোনও মুদ্রারই বয়স তিনশো বছরের কম নয়। তাহলে কী বুঝতে হবে, এইসব স্বর্ণমুদ্র তিন শতাব্দীর মধ্যে কোনও মানুষের ব্যবহারে আসেনি? কেবল কি মুদ্রা? মণিমুক্তোখচিত ভারী ভারী কতরকম জড়োঁয়া গহনা! সেরকম গহনাও একালে কারুর দেহেই শোভা পায় না।

অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। এ কী অদ্ভুত ঘর! এখানে এসে দাঁড়ালে বর্তমানের আধুনিকতা যেন চোখের সুমুখ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সুদূর অতীতের সমস্ত রহস্য যেন কার জাদুমন্ত্রে জীবন্ত হয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করে!

শুনেছিলুম এটা নাকি রাজার শয়নগৃহ। কিন্তু তিনি শয়ন করেন কোথায়? চারিদিকে তাকিয়েও কোনও খাট-পালঙ্ক, এমনকি ঘরের মেঝেতে পাতা কোনও শয্যা পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারলুম না। এটা শয়নগৃহ হলে মানতে হয়, এর মালিক শয়ন করেন ধূলিধূসর নগ্ন মেঝের উপরে। কিন্তু সেটাও সম্ভবপর বলে মনে হল না। দেখলুম ঘরের ভিতরে একদিকের দেওয়ালের গায়ে রয়েছে আর একটা দরজা। তার পাল্লা দুখানা বন্ধ ছিল বটে, কিন্তু ঠেলতেই খুলে গেল। আলো-আঁধারের মধ্যে দেখা গেল একটা সরু পথ। অগ্রসর হয়ে পথের শেষে দেখলুম, সঙ্কীর্ণ এক সার সিঁড়ি ঘুরতে ঘুরতে নীচের দিকে নেমে নীরন্ধ অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে। সে-

রকম অন্ধকারের মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে হল না। আবার ঘরের ভিতরে ফিরে এলুম। সেখানে খোঁজাখুঁজি করে একটা টেবিলের তলা থেকে বার করলুম। সেকেলে এক বাতিদান, তার উপরে রয়েছে তিন ভাগের এক ভাগ পোড়া একটা বাতি। বাতির মুখে আলো জেলে আবার সেই সরু পথটার ভিতর দিয়ে এগিয়ে সিঁড়িগুলোর কাছে গেলুম। তারপর খুব সাবধানে ধীরে ধীরে নামতে লাগলুম নীচের দিকে।

একটা জিনিস লক্ষ করলুম, সিঁড়ির প্রত্যেক ধাপেই জমে আছে যে কত যুগের পুরাতন ধুলো, আন্দাজে তা হিসাব করে বলা অসম্ভব। মনে হল, শতাব্দীর পরে এই সিঁড়িগুলোর উপরে সর্বপ্রথমে পড়ল আমার পদচিহ্ন। কারণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখেও ধুলার পটে পেলুম না। আর কারুর পায়ের দাগ। ভাবতে লাগলুম, প্রসাদের তিনতলায় রাজার শয়নগৃহের পাশে এক সার সিঁড়ি থাকার সার্থকতা কী? তবে কি এর নীচে আছে সেকলকার চোরাকুঠরির মতো কোনও একটা জায়গা,-সমূহ বিপদের সময়ে যার ভিতরে আত্মগোপন করা যায়?

যাচ্ছি, মনের ভিতরে ততই প্রবল হয়ে উঠছে একটা রোমাঞ্চকর অপার্থিব ভয়! আমার আত্মা যেন অনুভব করতে লাগল, ইহলোকের দিকে পিছন ফিরে এগিয়ে চলেছে সে অলৌকিক এক রহস্যের অভিমুখে।

অবশেষে বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেখানে গিয়ে দাঁড়ালুম সেখানে পায়ের তলায় পেলুম শীতল কাঁচা মাটির স্পর্শ। বোধহয় আমি আবার নেমে এসেছি বাড়ির একতলায়। সামনে আবার একটা গলিপথ। সেখানে বদ্ধ হাওয়ায় জমে রয়েছে কেমন একটা ভীষণ দুর্গন্ধ। সে যেন কোনও গলিত শবদেহের দুর্গন্ধ, তা সহ্য করা অসম্ভব। তাড়াতাড়ি নাকে কাপড় চাপা দিলুম, কিন্তু তবু তার কবল থেকে নিস্তার পেলুম না।

দ্বিগুণতর ভয়ে বুকের ভিতরে জাগল। ঘন-ঘন কম্পন। আমি কোথায় যাচ্ছি, কীসের এই দুর্গন্ধ? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলুম না বটে, তবু যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই পদচালনা করে গলিপথটার শেষে গিয়ে পেলুম আর একটা অত্যন্ত নিচু ও সঙ্কীর্ণ ঘর। সেখানকার বাতাস পর্যন্ত যেন বিষাক্ত, প্রতি মুহূর্তে শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। সেখানকার অন্ধকার এমন পুঞ্জীভূত যে, ক্ষীণ দীপশিখাটাকে দেখাতে লাগল। তার গায়ে একটা তুচ্ছ, রক্তহীন ও হলদে ক্ষতচিহ্নের মতো। সেখানকার আনাচে-আনাচে দৃষ্টিহীন দৃষ্টি মেলে আমার পানে তাকিয়ে আছে যেন এমন সব অভাবিত বিভীষিকা, যে-কোনও মুহূর্তে যারা সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো দৃশ্যমান হয়ে এক ফুৎকারে নিবিয়ে দিতে পারে জীবন-প্রদীপের শিখা।

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এইসব বিসদৃশ চিন্তাকে মনের ভিতর থেকে তাড়াবার চেষ্টা করতে লাগলুম। মনে মনে নিজের মনকে ডেকে নিজেই বলে উঠলুম-তুমি জাগ্রত হও, ভুলে যাও অন্য সব তুচ্ছ ভাবনা। তুমি এসে পড়েছ এখন রহস্যের শেষ প্রান্তে। এখন আর ইতস্তত করলে চলবে না।

ভিজে স্যাঁতসেঁতে দেওয়ালের গায়ে ছিল একটা কুলুঙ্গি। তার উপরেই রেখে দিলুম। বাতিদানটা। ঘরের কোনওদিকেই কোনও কিছুই নেই—কেবল মাঝখানে পড়ে আছে প্রকাণ্ড একটা কাঠের বাক্স। মেপে দেখলুম। বাক্সটা লম্বায় পাঁচ হাত, চওড়ায় দুই হাত। খুব মজবুত পুরু কাঠ দিয়ে তৈরি সেই বাক্সটা, তার ডালটা এত ভারী যে টেনে তুলতে যথেষ্ট শক্তির দরকার হয়।

কিন্তু ডালা তুলে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম বিদ্যুতাহতের মতো। দুঃস্বপ্নেও এমন দৃশ্য দেখবার জন্যে প্রস্তুত ছিলুম না!! কী ভয়ানক, কী ভয়ানক!

বাক্সের মধ্যে লম্বমান হয়ে শুয়ে রয়েছে রাজার দেহ। বুঝতে পারলুম না সে দেহ মৃত কি নিদ্রিত। কারণ, তার দুই চক্ষুই ছিল বটে উন্মুক্ত ও আড়ষ্ট, কিন্তু মৃতের চক্ষে থাকে যে-রকম অস্বাভাবিক ভাব, এখানে তার কোনওই চিহ্ন নেই; মুখের বিবর্ণিতার মধ্যেও ফুটে আছে যেন জীবনের তপ্ততা এবং ওষ্ঠাধরের আরক্ত আভাও মলিন হয়ে যায়নি কিছুমাত্র।

কিন্তু জ্যান্ত মানুষের বুক যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠে এবং নামে এই দেহে তার কোনও চিহ্নই নেই। বক্ষস্থল একেবারে স্থির। আমি রাজার উপরে নত হয়ে পড়লুম। জীবনের একটুখানি ইঙ্গিত পাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম, কিন্তু বৃথা, বৃথা, বৃথা।

আচম্বিতে লক্ষ করলুম, রাজার সেই আড়ষ্ট মৃত চক্ষুর ভিতরেও ফুটে আছে একটা বিজাতীয় ঘৃণার ভাব। সে চক্ষুদুটো আমাকে যে দেখতে পাচ্ছে না এবং আমার সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অচেতন এটাও আমি বুঝতে পারলুম বটে, কিন্তু সেই মারাত্মক মরা দৃষ্টি আমার অন্তরাত্মার মধ্যে করতে লাগল আতঙ্কবৃষ্টি। সহ্য করতে পারলুম না, প্রাণপণে ছুটে সেখান থেকে আমি পালিয়ে এলুম—এমনকি, বাতিদানটাও তুলে নিয়ে আসবার অবসর পর্যন্ত পেলুম না।

আজ, নয় কাল

সূর্য অস্তাচলে নেমে গিয়েছিল, কিন্তু তখনও আকাশের মেঘে মেঘে খেলা করছিল-খানিকটা পরিত্যক্ত রক্তরাগ। আর একটু পরেই হবে তিমিরাগুণ্ঠিতা সন্ধ্যার আগমন।

আজও আমি উপরের খোলা ছাদে একলা দাঁড়িয়ে ছিলুম। আমার বন্দিজীবনে এখানকার মুক্ত আলোক ও বাতাস ছাড়া আর কিছুই উপভোগ করবার উপায় নেই। তাই মাঝে মাঝে ছাদে না এসে থাকতে পারি না।

হঠাৎ দেখলুম রাজার ঘরের গবাক্ষের কাছে কী যেন একটা নড়ে নড়ে উঠছে। ভালো করে দেখেই আমার চোখ উঠল চমকে। এ যে একখানা ভয়ঙ্কর কালো মুখ! মানুষের মুখ নয়, কোনও কুৎসিত জন্তুর মুখ। তার দুটো ছোটো-ছোটো চোখে কী বিষম তীব্রতা! মনে হল, জ্বলন্ত চক্ষে সেই মুখখানা তাকিয়ে আছে আমার পানে।

আলোক তখন অস্পষ্ট, ওটা যে কী জন্তু তা আন্দাজ করা গেল না। তারপর আমার দৃষ্টিকে অধিকতর বিস্মিত করে সেই জন্তুর সমস্ত দেহটা করলে আত্মপ্রকাশ। একটা মস্ত বড়ো বাদুড়। বাদুড় যে এমনভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে মানুষের ঘরে বসে থাকতে পারে, সে ধারণা আমার ছিল না। তারপরেই মনে হল, রাজা তো মানুষের দেহেও মানুষ নন। তঁকে অমানুষ বললেও কোনও অত্যুক্তি হয় না। এমন অমানুষের সঙ্গে যে বাদুড় ও পেচক প্রভৃতি অমঙ্গলকর জীব বাস করবে, তাতে আর সন্দেহ কী?

বাদুড়টা তখনও মুখ ফিরিয়ে আছে আমার দিকে। অমন করে ও আমাকে দেখছে কেন? আমাকে দেখে ওর তো লুকিয়ে পড়বার কথা। তাকে ভয় দেখাবার জন্যে আমি জোরে কয়েকবার হাততালি দিলুম। তার দুই ক্রুদ্ধ চক্ষে ঠিকরে পড়ল যেন আগুনের ফিনকি! তারপর সে হঠাৎ উঠে

ছাদের প্রাচীরের উপরে এসে বসল এবং আবার দীপ্ত চক্ষে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে।

এ-রকম আশ্চর্য বাদুড় জীবনে কখনও দেখিনি। মানুষকেও ভয় করে না, উলটে মানুষের কাছে এগিয়ে আসে এবং জ্বলন্ত চোখ পাকিয়ে চেষ্টা করে ভয় দেখাবার!

একবার ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে বাদুড়টার উপরে এক ঘুসি বসিয়ে দিই। কিন্তু তাও পারলুম। না, কেমন ভয় হল। হয়তো রাজা যেমন মানুষ হয়েও মানুষ নন, এই বাদুড়ের পিছনেও তেমনই কোনও রহস্য আছে। হয়তো এটাকে বাদুড়ের মতন দেখালেও বাদুড় নয়।

দূর থেকে তাকে ছুড়ে মারবার জন্যে ছাদের উপরে হেঁট হয়ে একখণ্ড ইষ্টক তুলে নিলুম। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাত তুলেই দেখি বাদুড়টা আর সেখানে নেই, দুদিকে দুখানা পাখনা বিছিয়ে দিয়ে সবেগে উড়ে যাচ্ছে সান্ধ্য আকাশের তলায় প্রকাণ্ড একটা অভিশপ্ত কালো প্রজাপতির মতো।

অন্ধকার ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। ধীরে, ধীরে, ধীরে। আর ছাদের উপরে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা। এখনই এখানে এসে দেখা দিতে পারে সেই তিন পোতনির মূর্তি। তাদের কথা স্মরণ করেই বুক ধড়াস করে উঠল। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরের ভিতরে পালিয়ে এলুম। তারপর বিছানার উপর শুয়ে পড়তেই অসময়ে চোখে এল ঘুম।

খানিক পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখি, আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রাজা স্বয়ং। তার মুখ এমন গভীর যে দেখলেও ভয় হয়।

কিন্তু রাজা শোনালেন সুমিষ্ট এক আশ্বাসবাণী। অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে বললেন, বন্ধু, এখানে আজই আপনার শেষ রাত্রি। কালকেই আপনি

কলকাতায় যাত্রা করতে পারবেন। আমি আজই আপনার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, কারণ আর একটু পরেই আমাকেও করতে হবে বিদেশ যাত্রা। বিশেষ এক গোপনীয় কারণে আমাকে বাইরে যেতে হচ্ছে, কিন্তু আপনার যাওয়ার জন্যে যা কিছু ব্যবস্থা তা আমি করে যাব।

এই হানাবাড়িতে আমাকে একলা থাকতে হবে? এমন চিন্তাও আমার পক্ষে ভয়াবহ। বললুম, 'আমিও তো আজকেই যেতে পারি?

—তা হয় না বিনয়বাবু। আমার কোচম্যান আজ এখানে নেই।

কিন্তু যদি আপনি আদেশ দেন, তাহলে আমি পায় হেঁটেই এখন থেকে যাত্রা করতে পারি।

রাজা হাসলেন একটুখানি শান্ত হাসি। আমার সন্দেহ হল, এই শান্ত হাসির পিছনে আছে নিশ্চয়ই কোনও নূতন অশান্তি। তিনি বললেন, সঙ্গের জিনিসপত্তর না নিয়েই আপনি চলে যেতে চান?

—চুলোয় যাক জিনিসপত্তর! পরে সেগুলো নিয়ে যাবার জন্যে আমি লোক পাঠিয়ে দেব।

অতিশয় ভদ্রের মতো মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, বেশ, তাহলে আসুন, বন্ধু! আপনি যদি এখনই যেতে চান, আমি কোনওই বাধা দেব না। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আপনাকে ধরে রাখতে ইচ্ছা করি না।

মন উচ্ছসিত হয়ে উঠল বিপুল আনন্দে। কিন্তু মনের ভাব বাইরে গোপন করে রাজার পিছনে পিছনে আমি হলুম অগ্রসর। সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে একেবারে সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

রাজা দরজার পাল্লা দুখানা খুলে দিলেন-খানিকটা চাঁদের আলো দ্বারপথের ভিতরে এসে পড়ল। রাজা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, শুনুন।

সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বে তুললেন তাঁর দীর্ঘ একখানা বাহু এবং তাঁর বাহু উর্ধ্বোত্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার ত্রস্ত কর্ণে প্রবেশ করল একদল নেকড়ে বাঘের বীভৎস চিৎকার-ধ্বনি। তারপরেই সভয়ে দেখলুম, আঙিনা জুড়ে দরজার দিকে পালে পালে ছুটে আসছে নেকড়ের পর নেকড়ে! তাদের ক্রুর চক্ষু ও নির্দয় দাঁতগুলো ঝকঝকি করে উঠছে চাঁদের আলোয়।

আমি বাড়ির ভিতর পালিয়ে আসবার চেষ্টা করতেই রাজা বজ্রমুষ্টিতে ডান হাতটা চেপে ধরলেন। আমি তাঁকে বাধা দেবার চেষ্টা করলুম না, কারণ চেষ্টা করলেও আমি সফল হতুম নাআগেই পেয়েছি। ওই বাহুর শক্তির পরিচয়। নাচার হয়ে তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে রইলুম।

হঠাৎ মনে হল একটা ভয়ানক কথা। নেকড়েগুলো তখন আমাদের খুব কাছেই এসে পড়েছে। দুরাত্মা রাজা কি নেকড়েদের কবলেই আমাকে সমর্পণ করতে চান? তাড়াতাড়ি চেচিয়ে বলে উঠলুম, দরজা বন্ধ করুন, আজ আমি এখান থেকে যেতে চাই না!

নির্বাক মুখে সশব্দে রাজা দরজার পাল্লা দুটো আবার বন্ধ করে দিলেন। এবং নির্বাক মুখেই দুজনে আবার দৌতালার ঘরে এসে দাঁড়ালুম। তারপর মৌনব্রত ভঙ্গ না করেই রাজা আবার ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ঘরের দরজাটা ভিতর থেকে আমি বন্ধ করে দিলুম।

অল্পক্ষণ পরে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমি যখন শোবার চেষ্টা করছি, তখন হঠাৎ আমার ঘরের দরজার ওপাশে শুনতে পেলুম কদের কণ্ঠস্বর। ফিস-ফিস করে কারা কথা কইছে। দরজার উপরে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলুম।

রাজা বলছেন, বিদেয় হ, বিদেয় হ! নিজের জায়গায় চলে যা! এখনও তোদের সময় আসেনি। সবুর কর! ধৈর্য ধর! আজকের রাত হচ্ছে আমার। কাল আসবে তোদের রাত।

তারপরেই শুনতে পেলুম নিম্ন। অথচ মিষ্ট মেয়ে-গলায় খিলখিল করে হাসির রোল।

দুর্জয় ক্রোধে স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে গেলুম। সশব্দে দরজাটা খুলে ফেলে দেখলুম, সেই তিনটে প্রেতিনী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের নিজের জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। আমাকে দেখেই তারা খলখল অট্টহাস্য করে উঠে দ্রুতপদে সেখান থেকে অদৃশ্য হল।

দাঁড়িয়ে রইলুম পাথরের পুতুলের মতো। আজ নয়, কাল? আমার অন্তিমকাল কি এতখানি ঘনিয়ে এসেছে? আজ নয়, কাল—আজ নয়, কাল! ভগবান, ভগবান, ভগবান!

মুক্তি

সকাল হবার আগেই আমার ঘুম গেল ভেঙে। আজ আমার মৃত্যুর দিন। কিন্তু মৃত্যু যদি আসে। আমি অপ্রস্তুত অবস্থায় আত্মদান করব না।

দূর থেকে একটা মোরগ ডেকে উঠে। পৃথিবীকে জানিয়ে দিলে, আবার এসেছে নতুন প্রভাত।

মৃত্যুকে আসন্ন জেনেও মন হল প্রসন্ন। বুঝলুম, রাত্রি যখন বিদায় নিয়েছে, তার বিভীষিকাগুলো এখন আর আমাকে ভয় দেখাতে আসবে না। আকাশে যতক্ষণ সূর্য আছে, আমিও ততক্ষণ নিরাপদ। কিন্তু এই দিনের আলো থাকতে থাকতেই আজ আমাকে প্রাণপণে বাঁচবার চেষ্টা করতে হবে।

প্রথমেই মনে জাগল একটা দুর্দমনীয় ইচ্ছা। রাজা কোথায় আছেন আমি জানি, আমি আর একবার তাকে দেখতে চাই।

প্রথম দিন যে উপায়ে রাজার ঘরে ঢুকেছিলুম, সেদিনও তাই করলুম। ভাবলুম, রাজা যদি জেগে থাকেন, তাহলে নিশ্চয় এই মুহূর্তেই আমাকে হত্যা করবেন। কিন্তু আজই যখন আমাকে মরতে হবে, তখন আর মৃত্যুকে ভয় করে লাভ কী? এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম। না, আজও রাজা ঘরে নেই।

সেদিনও বাতিটা নিয়ে ঘরের ভিতরকার দরজা দিয়ে আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলুম। হঠাৎ মনে পড়ুল, এই বাতিদানটা সেদিন আমি ফেলে এসেছিলুম নীচেকার ঘরের কুলুঙ্গিতে। কিন্তু বাতিদানটা আবার উপরে নিয়ে এল কে? নিশ্চয়ই রাজা নিজেই। তাহলে তার কাছে প্রকাশ হয়ে গেছে আমার সব কীর্তি? বুঝেছি, এইজন্যেই হয়েছে আমার উপরে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ। রাজার গুপ্ত কথা যখন জেনে ফেলেছি, তখন আর আমার রেহাই নেই। উত্তম! তাহলে আমিও আজ রাজাকে একবার ভালো করে দেখে নিতে চাই!

সেই স্যাঁতসেঁতে ভীষণ অন্ধকার গৃহ, সেই অসহনীয় গলিত শবের দুর্গন্ধ। সেই প্রকাণ্ড বাক্সটা আবার পড়ে আছে আমার চোখের সুমুখে।

দুই হাতে টেনে ভারী ডালটা খুলে ফেললুম। তারপর এমন কিছু দেখলুম যে, আমার আত্মা পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠল কল্পনাতীত এক আতঙ্কে।

তেমনিভাবেই চিত হয়ে বাক্সের ভিতরে রাজা শুয়ে আছেন, কিন্তু রাজার জরাগ্রস্ত দেহের ভিতরে আবার ফিরে এসেছে যেন যৌবনের তারুণ্য। মাথার সেই ধবধবে সাদা চুলগুলো পর্যন্ত আবার কালো হয়ে

উঠেছে। তাঁর দুই গণ্ড ছিল কোটরগত, এখন হয়েছে পুরন্ত। সারা মুখখানার উপরে ফুটে উঠেছে গোলাপি আভা। কিন্তু রাজার ওষ্ঠধরের দুই পার্শ্ব দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ও কীসের চিহ্ন? রক্ত, রক্ত? হ্যাঁ, রাজার ঠোঁটের দুই পাশ দিয়ে রক্তধারা গড়িয়ে তাঁর চিবুক ও কণ্ঠদেশ পর্যন্ত করে দিয়েছে চিহ্নিত। এমনকি, তাঁর সেই বীভৎস চোখদুটোও হয়ে উঠেছে যেন নবজীবনের উচ্ছাসে জীবন্ত। বোধ হল, এই ভয়াবহ জীবটা কার রক্ত পান করে দেহের ভিতরে আবার সঞ্চয় করেছে নবযৌবনের শক্তি ও স্বাস্থ্য।

বুকটা আমার শিউরে শিউরে উঠতে লাগল, কিন্তু সমস্ত অন্তরাত্মা হয়ে উঠল বিদ্রোহী। ভালো করে একবার রাজার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলুম। মনে হল, আমাকে দেখে সে-মুখ যেন হাসছে বিদ্রুপ-হাস্য। সেই হাসি দেখে রাগে আমি যেন পাগলের মতো হয়ে উঠলুম। এই অমানুষিক মানুষ পৃথিবীতে প্রতিদিন করছে নরহত্যার পর নরহত্যা এবং এখনও হয়তো করবে: আরও কত নির্দোষ প্রাণীকে হত্যা। এ যখন কলকাতাতেও যেতে চায়, তখন বোধ হচ্ছে সেখানে গিয়েও দিনের পর দিন দেবে আরও কত নরবলি। আর এই পিশাচকেই কলকাতায় নিয়ে যাবার জন্যে সাহায্য করতে আজ আমি এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি! এই মূর্ত মহাপাপ কলকাতায় গিয়ে যদি হাজির হয়, তবে তার সমস্ত অপরাধের জন্যে দায়ী হতে হবে আমাকেই। না, আমি একে কিছুতেই সে সুযোগ দেব না!

ঘরের এদিকে ওদিকে তাকিয়ে দেখলুম, মেঝের উপরে পড়ে রয়েছে একটা ভারী শাবল। আমি তখনই শাবলটা নিয়ে মাথার উপরে তুলে ধরলুম, তারপর মূর্তিটাকে লক্ষ্য করে আঘাত করলুম। সবলে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজার মুখখানা হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বিজাতীয় চক্ষু দিয়ে করলে যেন অগ্নিশিখা বর্ষণ। আমার দেহ হয়ে গেল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো

আড়ষ্ট এবং হাতের শাবলটা লক্ষ্যচ্যুত হয়ে রাজার কপালের উপর দিয়ে চলে গিয়ে কেবল একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করলে। শাবলটা আবার যখন টেনে তুলতে গেলুম, তখন তার ধাক্কা লেগে বাক্সের ডালাটা আবার পড়ে গেল সশব্দে। সে ডালাটা আর আমার খোলবার ইচ্ছা হল না। জীবন্ত মৃতদেহের যে দৃশ্য দেখলুম, আমার পক্ষে হল। তাই-ই যথেষ্ট।

ভাবতে আর ভাবতে আর ভাবতে লাগলুম, অতঃপর আমার কর্তব্য কী? যেমন করেই হোক, আজ দিনের বেলাতেই এখান থেকে পালাতে না পারলে আমার পক্ষে আজকের রাত্রিই হবে। শেষের রাত্রি।

বাড়ির উপরতলা থেকে একতলায় নামবার উপায় তো আমার হাতেই রয়েছে। দেওয়ালের গায়ে যে-পথটা বাড়ি থেকে বেরুবার জন্যে রাজা নিজে ব্যবহার করতেন, যদিও তাকে কুপথ বা বিপথ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না, তবু সেই পথই আজ আমাকে বাড়ির ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে যাবে। কারণ, রাজার মতন আমিও জানি ওই পথটা কেমন করে ব্যবহার করতে হয়।

কিন্তু কেবল বাড়ির বাইরে গেলেই তো চলবে না, বাইরের অঙ্গনের পরেই আছে বিশালগড়ের অত্যন্ত উচ্চ প্রাচীর। সেই দুরারোহ প্রাচীর পার না হতে পারলে বাড়ির বাইরে গিয়ে কোনওই লাভ নেই।

প্রাঙ্গণের ভিতরে কাল রাত্রে দেখেছি রাজার পোষ মানা সেই নেকড়ে-বাঘগুলোকে। হয়তো আজ দিনের বেলায় তারা এখানে পাহারা দিচ্ছে না। খুব সম্ভব ওই নেকড়েগুলোও হচ্ছে রাজার মতো নিশাচর, দিনের আলোয় আসতে ভয় পায়।

কিন্তু প্রাচীর পার হই। কেমন করে-প্রাচীর পার হই। কেমন করে! মনে মনে এই কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির তেতলায় গিয়ে উঠলুম। সেখানে

সেই যে ধূলো-জঞ্জল-আবর্জনাভরা ছোটো ছোটো দুখানা কামরা দেখেছিলুম, সে-দুটোর দরজা তালা দিয়ে বন্ধ থাকে না; হঠাৎ মনে পড়ল তারই একখানার ভিতরে দেখেছিলুম অনেকগুলো নারিকেল দড়ি। আজও আবার সেই ঘরে ঢুকে দেখলুম, দড়ির গোছা যথাস্থানে সেইভাবেই পড়ে রয়েছে। সেই দড়িগুলো নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পাকিয়ে ও যুক্ত করে সুদীর্ঘ একগাছা কাছি তৈরি করে ফেললুম। তারপর আবার নীচে নেমে এলুম।

ঘরের জানলার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রাঙ্গণ ও প্রাচীরের এধার ওধার পর্যন্ত লক্ষ করে দেখতে লাগলুম। কারণ কাছি বুলিয়ে আমি প্রাচীরের বাইরের দিকে নেমে যেতে পারি বটে, কিন্তু ভিতরের দিক থেকে প্রাচীরের উপরে আরোহণ করব কী উপায়ে?

ভগবানের আশীর্বাদে তারও উপায় আবিষ্কার করে ফেললুম। অঙ্গনের ভিতরে প্রায় প্রাচীর ঘেঁষেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সুউচ্চ ও প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষ এবং তারই কতকগুলো মোটা মোটা ডাল প্রাচীরের উপর দিয়ে বাইরে গিয়ে পড়েছে। ওই গাছটা হবে এখন আমার অবলম্বন।

এর পরের কথা আর বিস্তৃতভাবে বলবার দরকার নেই। মিনিট কয়েকের মধ্যেই বাড়ির বাইরে অঙ্গনের ভিতরে গিয়ে পড়লুম। কোথায়ও জনপ্রাণীর সাড়া নেই, কেউ আমাকে বাধা দিতে এল না। গাছে উঠে ডাল ধরে প্রাচীরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর প্রাচীরের উপর দিয়ে বেরিয়ে-পড়া একটা ডালে কাছিগাছা বেঁধে ঝুলে পড়লুম দুর্গা বলে। পুনর্বার ভূমিষ্ঠ হতে বেশিক্ষণ লাগল না।

আবার আমি স্বাধীন! নরকের ভিতর থেকে আমি ধরিত্রীর শ্যাম কোলে ফিরে এসেছি! নরকের দূতরা আর আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না!

শরীরী প্রেত-শরীরী প্রেত! তার কথা জীবনে কোনওদিন শুনিনি, কিন্তু এখানে এসে তাকে দেখেছি। স্বচক্ষে। তার কথা আর অবিশ্বাস করতে পারব না।

খুব সম্ভব এর পর এই শরীরী প্রেতের কর্মক্ষেত্র হবে কলকাতার মুক্ত জনতার মধ্যে। শরীরী প্রেতকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিলুম, পারিনি। কিন্তু তার অমানুষিক কবল থেকে কলকাতাকে রক্ষা করতে হবে,- রক্ষা করতে হবেই! এখন আমার সামনে রইল কেবল এই কর্তব্য।

খালি পা। দেহে আছে খালি ময়লা গেঞ্জি ও কাপড়। এই বেশে আমার এই ছন্নছাড়া চেহারা দেখলে কেউ হয়তো আমাকে ভদ্রলোক বলে স্বীকার করবে না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। এখন যে-কোনও উপায়ে একবার কলকাতায় গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়।

পথ-খরচের জন্যে ভাবি না। পথ-খরচের জন্যে যে টাকার দরকার হবে, এটা আমি ভুলিনি। তাই বাড়ির বাইরে আসবার আগে রাজার ঘরের সেই টেবিলের উপর থেকে আমি দুই মুঠো সোনার মোহর পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

(বিনয়ের ডায়েরি আপাতত এইখানেই শেষ হল।)

উত্তরার্ধ

কলকাতার ভ্যাম্পায়ার

অবিনাশবাবু একজন রীতিমতো মজলিশি লোক। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের উপরে ছিল তার বসতবাড়িখানি। সেইখানে রোজ সন্ধ্যায় তাঁর বৈঠকখানায় হত নানা শ্রেণীর লোকের আগমন। এবং রোজই সেখানে তপ্ত পিয়ালার গরম চায়ের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশত। সিগার-সিগারেট বা গড়গড়ার ঘূর্ণায়মান ধূম্ররাশি। তার উপরে প্রতিদিন যে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবারের ব্যবস্থা হত না, অবিনাশবাবু সম্বন্ধে এমন অভিযোগও করা যায় না।

অবিনাশবাবু পঞ্চাশের ওপারে গিয়ে পড়েছেন। অর্থাৎ তাঁকে বৃদ্ধ বললেও তিনি আপত্তি করতে পারবেন না—যদিও তাঁর মাথার চুল ও ঠোঁটের উপরকার গোঁফজোড়াটি এখনও পক্কতার উপরে দাবি করতে পারে না। তাঁর দেহ এখনও আছে দস্তুর মতো কর্মঠ ও বলিষ্ঠ। তাঁর পিতা পরলোকে যাবার সময় ইহলোকে এমন কিছু রেখে গিয়েছেন যার মহিমায় অবিনাশবাবুকে কোনওদিনই ভাবতে হয়নি। ভাত-কাপড়ের দুর্ভাবনা। সংসারের ভাবনাকেও জলাঞ্জলি দিতে পেরেছেন, কারণ আজ পর্যন্ত তিনি সুদূরে পরিহার করে এসেছেন বিবাহ নামক সুপ্রসিদ্ধ উপদ্রবটা। বিয়ের পর রাঙাবউ আসা ব্যাপারটা নিতান্ত মন্দ নয়, তবে ওই পর্যন্ত। তারপর আসতে শুরু করে যখন ‘পুত্রকন্যার প্রবল বন্যা’, ব্যাপারটা তখন গুরুতর হয়ে ওঠবার উপক্রম করে। তারপরে সেই সূত্রে আসে যে কতরকম বিপদ, বিভ্রাট ও বিভীষিকা, এখানে তার তালিকা দাখিল করবার দরকার নেই।

অতএব আপনারা খালি এইটুকুই জেনে খুশি থাকুন, অবিনাশবাবুর গৃহস্থলিতে তিনি নিজেই হচ্ছেন এক এবং অদ্বিতীয়।

কিন্তু তাঁর বৈঠকখানায় রোজ যে নিয়মিত আসরটি বসে, তার প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা নেই। এই আসরের মাঝখানটিতে বসতে পারলেই তিনি ছাড়তে পারেন আরামের নিঃশ্বাস। প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত রোজই সেখানে চলে তাস-দাবা-পাশা খেলা এবং গোটা দুনিয়াকে নিয়ে উত্তপ্ত বা অল্পতপ্ত বা অতি শান্ত আলোচনা। সন্ধ্যা ও প্রথম রাত্রিটা এইভাবে না। কাটালে তার উপরে দয়া করতেন না নিদ্রাদেবী।

অবিনাশবাবুর আর একটি শখ হচ্ছে প্রেততত্ত্ব নিয়ে গবেষণা। এ-বিষয় নিয়ে হাতে-নাতে পরীক্ষা করে নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি প্রকাশ করেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ। বাংলায় ও বাংলার বাইরেও প্রথম শ্রেণীর প্রেততত্ত্ববিদ বলে অবিনাশবাবুর খ্যাতি বিশেষভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সম্বন্ধে কারুর কোনও জিজ্ঞাসা থাকলেই জবাব খোঁজবার জন্যে তিনি হতেন অবিনাশবাবুর দ্বারস্থ। এই জিজ্ঞাসুদের জন্যে অবিনাশবাবু প্রতিদিনই অনেকটা সময় ব্যয় করতে বাধ্য হন।

সেদিন সকালবেলা বৈঠকখানায় প্রবেশ করে অবিনাশবাবু দেখলেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন একটি যুবক। মানুষটির মনের ভিতরে যে বিশেষ এক উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে, মুখ দেখলে সে কথা বুঝতে বিলম্ব হয় না।

অবিনাশবাবু নিজের নির্দিষ্ট আসনখানি গ্রহণ করে জিজ্ঞাসু চোখে যুবকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

যুবক শুধোলে, মহাশয়ের নাম কি অবিনাশবাবু?

অবিনাশবাবু নীরবে ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

—একটি গুরুতর কারণে আমি আপনার কাছে এসেছি

—কারণটি কী?

—কারণ বলার আগে এই খবরের কাগজের একটা জায়গা আপনাকে পড়ে শোনাতে পারি?

—অনায়াসেই।

যুবক একখানি খবরের কাগজ বার করে পাঠ করতে লাগল।

‘

কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে কয়েকটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রত্যেকটি ঘটনা কেবল রহস্যময়ই নহে, উপরন্তু রীতিমতো বিপজ্জনক। এমনকি, সাঙ্ঘাতিক!

‘গত একমাসের মধ্যে ওখানে একই কারণে সাতজন লোক মারা পড়িয়াছে। ভারতের প্রধান নগর কলিকাতায় মাত্র সাতজনের মৃত্যুকে উল্লেখযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না, প্রতি মিনিটেই সেখানে হয়তো একাধিক ব্যক্তি করিতেছে মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পণ। তথাপি এই সাতজন লোকের মৃত্যু লইয়া কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে যে অত্যন্ত বিভীষিকার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার বিশেষ কারণের অভাব নাই।

কারণগুলি এই

‘পরে-পরে এই সাতজন লোকেরই মৃত্যু হইয়াছে শয্যায় শায়িত অবস্থায়, নিদ্রার সময়ে।

‘প্রত্যেক লোকটিরই স্বাস্থ্য ছিল ভালো এবং কোনও পীড়ায় তাহাদের মৃত্যু ঘটে নাই। যদিও হত ব্যক্তিদের প্রত্যেকের কণ্ঠদেশে পাওয়া গিয়াছে অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন, তবু কোনও হত্যাকারীর কবলে পড়িয়া যে তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে, এমন সন্দেহ প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কারণ, প্রতি

ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তিরা ছিল রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যে। প্রতি ঘটনাস্থলেই বাহিরের কোনও লোকের প্রবেশ ও প্রস্থানের কিছুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। কোনও মৃত ব্যক্তিরই এমন শত্রু ছিল না, যে তাহাকে হত্যা করিতে পারে। কাহারও ঘর হইতে কোনও মূল্যবান দ্রব্যও অদৃশ্য হয় নাই।

অথচ প্রত্যেকেই মারা পড়িয়াছে একই অস্বাভাবিক কারণে। ডাক্তারি পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, প্রত্যেকেরই মৃত্যুর কারণ রক্তহীনতা। মৃত ব্যক্তিদের কাহারও রক্তহীনতা ব্যাধি ছিল না, অথচ কোনও মৃত ব্যক্তিরই দেহের মধ্যে পাওয়া যায় নাই একবিন্দু রক্তের অস্তিত্ব। রক্তহীনতা ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটিলেও মানুষের দেহের এমন অবস্থা ঘটে না। দেখিলে মনে হয়, তাহাদের দেহের ভিতর হইতে সমস্ত রক্ত যেন নিঃশেষে শোষণ করিয়া লওয়া হইয়াছে। এক মাসের মধ্যে উপরউপরি সাত-সাতজন লোকের একই কারণে এমনভাবে মৃত্যু হওয়াতে শহরের উত্তরাঞ্চলে এক ভয়াবহ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে।

কাহারও কাহারও ধারণা, এ একরকম নূতন রহস্যময় ব্যাধি, হয়তো অবিলম্বে সাবধান না। হইলে এই বিশেষ ব্যাধি মড়কের আকারে আত্মপ্রকাশ করিবে:

কেহ-কেহ এই ঘটনাগুলিকে ভৌতিক ব্যাপার বলিয়া সন্দেহ করিতেছে। কিন্তু পুলিশ বিপদে পড়িয়াছে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিরই কণ্ঠের উপরকার সেই ক্ষুদ্র ক্ষতচিহ্ন লইয়া। মৃত্যুর আগে তাহাদের কাহারও কণ্ঠে যে ও-রকম ক্ষতচিহ্ন ছিল না, তাহারও নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ওই সব ক্ষতচিহ্নের জন্য দায়ী কে? এটুকুও বুঝা গিয়েছে, অত ছোটো ক্ষতের জন্য কোনও মানুষের মৃত্যু হইতে পারে না। কিন্তু ওই লোকগুলির মৃত্যুর

সঙ্গে যে ওই-সব ক্ষতের বিশেষ একটি সম্পর্ক আছে, সে বিষয়েও কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

'কোনও কোনও লোক আর-এক মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, এইসব মৃত্যুর জন্য দায়ী হইতেছে Vampire Bat বা পিশাচ-বাদুড়। এই জাতীয় বাদুড়দের স্বভাব, নিদ্রিত জীবজন্তুদের রক্ত শোষণ করা ।

তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কেহ-কেহ যুক্তি করিয়োছেন, বিশাচ-বাদুড়ের স্বদেশ হইতেছে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা। ও-শ্রেণীর বাদুড় পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। উত্তরে প্রথম দল বলিতেছেন, পিশাচ-বাদুড়রা যে কেবলমাত্র আমেরিকাতেই বাস করে, একথা তাঁহাদেরও কাছে অবিদিত নাই। কিন্তু দৈবগতিকে ওই জাতীয় দু-একটা বাদুড় যে ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িতে পারে না, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। হয়তো আমেরিকা হইতে আগত কোনও জাহাজের সঙ্গে সকলের অজ্ঞাতসারেই তাহারা কলিক্তায় আসিয়া পড়িয়াছে।

এ সম্বন্ধে কাহার কথা সত্য ও কাহার কথা মিথ্যা, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারই যে অত্যন্ত রহস্যময় ও বিপজ্জনক, সকলকেই সে কথা স্বীকার করিতে হইবে।

পড়া সাঙ্গ করে যুবকটি বললে, এ-সম্বন্ধে আপনার মত কী?

অবিনাশবাবু বললেন, আমার কোনও মতামত নেই। আপনি পড়লেন, আমি শুনলুম— এইমাত্র।

—লোকগুলি এমনভাবে যে মারা পড়ল, তার কি কোনও বিশেষ কারণ থাকতে পারে না?

—কারণ তো অনেকেই দেখিয়েছে, আমি আর নতুন কী কারণ দেখাতে পারি?

—আজ্ঞে, আপনি তাই পারেন বলেই আমি আপনার কাছে এসেছি।

—কী রকম? আমি গোয়েন্দাও নই, ডাক্তারও নাই; মৃত্যুর বা হত্যার রহস্য নিয়ে কোনওদিনই কারবার করিনি।

—কিন্তু আপনি হচ্ছেন বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেততত্ত্ববিদ।

অবিনাশবাবুর দৃষ্টি সচকিত হয়ে উঠল। চেয়ারের উপরে সোজা হয়ে বসে যুবকের মুখের উপরে ভালো করে তিনি একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, আপনার নাম কী?

—শ্রীবিনয়ভূষণ ভৌমিক।

—কী করেন?

—আমাকে আইন-ব্যবসায়ী বলে মনে করতে পারেন।

—আমি প্রেততত্ত্ববিদ বলেই কি আপনি আমার কাছে এসেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আপনি কি মনে করেন, খবরের কাগজের ওই রহস্যময় ঘটনাগুলোর সঙ্গে প্রেততত্ত্বের কোনও সম্বন্ধ আছে?

—আজ্ঞে, তা না মনে করলে আপনার কাছে আসব কেন?

—আপনার এ-রকম সন্দেহের কোনও কারণ বুঝলুম না।

বিনয় সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে, "Vampire কাকে বলে?

—সার্বিয়ান ভাষার Vampir শব্দ থেকে ইংরেজি এই Vampire কথাটির জন্ম। সার্বিয়ানদের বিশ্বাস, কোনও দানব বা সদ্যোমৃত লোকের প্রেতাত্মা অন্য কোনও মানুষের মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করে জীবন্ত জীবদের রক্ত শোষণ করে বেড়ায়। বাংলায় Vampire কে আমরা পিশাচ বলে ডাকতে পারি।

—আচ্ছা অবিনাশবাবু, পৃথিবীতে পিশাচ আছে, এটা কি আপনি বিশ্বাস করেন?

—করি।

—আপনি কখনও পিশাচ দেখেছেন?

—স্বচক্ষে দেখিনি, কিন্তু তার অস্তিত্বের অনেক প্রমাণ পেয়েছি।

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কলকাতাতেও এক দুর্দান্ত পিশাচের আবির্ভাব হয়েছে। ওই সাতজন লোকের মৃত্যু তারই কীর্তি।

অবিনাশবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, কোনওরকম প্রমাণ না পেয়েই আপনি এই আশ্চর্য সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন?

—না অবিনাশবাবু, তা নয়। আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

—যথা?

—ঠিক ওভাবে আমি কোনও প্রমাণ দেখাতে চাই না। আপনার কাছে একটি কাহিনি বলতে চাই, আর সে-কাহিনির নায়ক হচ্ছি আমিই। আপনি কি দয়া করে সে কাহিনিটি শুনবেন?

বিনয়ের মুখের উপরে আর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, বেশ, আমার কোনও আপত্তি নেই।

তারপর বিনয় একে-একে যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ করলে সে সব কথা তার ডায়েরি পাঠ করে আগেই আমরা জানতে পেরেছি।

গভীর মুখে খুব মন দিয়ে অবিনাশবাবু কাহিনির সমস্তটা শ্রবণ করলেন। খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে, যেন নিজের মনে মৃদু স্বরে বললেন, এ-রকম আশ্চর্য কাহিনি আর কখনও আমি শুনিনি। বিনয়বাবু, আপনি যা বললেন তা শ্রবণ করে আমার মনে কয়েকটা প্রশ্ন জাগছে।

—কী-কী প্রশ্ন?

—আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের সেই ভাঙা বাগানবাড়িটা রাজা রুদ্রপ্রতাপ সিংহ কি এরই মধ্যে কিনে নিয়েছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—রাজা কি বাড়িখানা কেনবার জন্যে নিজেই কলকাতায় এসেছিলেন?

—না। তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।

—রাজা কলকাতায় এসেছেন বলে আপনারা কি কোনও খবর পেয়েছেন ?

—না।

—ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়িতে এখন কোনও লোক বাস করে কি?

—একদিন আমি বাড়িখানা দেখতে গিয়েছিলুম। বাড়ির দরজায় তালাবন্ধ ছিল। কিন্তু বাগানের কোণে যেখানে মালিদের ঘর আছে সেখানে এসে আড্ডা গেড়েছে একদল বেদে জাতের লোক। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলুম, রাজা এখনও কলকাতায় আসেননি। কিন্তু রাজা না এলেও ওই বেদেগুলো যে রাজারই আশ্রিত লোক, এ বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নেই। রাজার বিশালগড়েও আমি অনেক বেদে দেখেছি।

—কলকাতায় এই যে রক্তহীনতার জন্যে সাতজন লোকের মৃত্যু হয়েছে, আপনি কি সন্দেহ করেন যে এর মধ্যে রাজার কোনও হাত আছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সন্দেহ করি না বললে সত্য বলা হয় না।

—রাজা যদি কলকাতায় না থাকেন, তাহলে ওই মৃত্যুগুলোর জন্যে তিনি দায়ী হবেন কেন?

—আমার বিশ্বাস, রাজা কলকাতাতেই আছেন। বেদেরা আমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে।

—আপনার এ-রকম বিশ্বাসের কারণ বুঝলুম না।

—একটা কারণের কথা আমি বলতে পারি, কিন্তু বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে!

—কেন ?

কথাটা এতই আজগুবি, শুনলে হয়তো আমাকে আপনি পাগল বলে মনে করবেন।

অবিনাশবাবু একটুখানি হেসে বললেন, আজ যে কাহিনি আমাকে বললেন, তা শুনেও যখন আপনাকে পাগল বলে মনে করিনি, তখন আরও কিছু অদ্ভুত কথা শুনলে আপনার সম্বন্ধে আমার আগেকার ধারণা একটুও বদলাবে না। বিনয়বাবু, আমি প্রেততত্ত্ববিদ। অনেকের মতে প্রেততত্ত্বটাই হচ্ছে একটা আজগুবি ব্যাপার। কিন্তু আমি ভূত যখন মানি, আমার কাছে অলৌকিক বা আজগুবি বলে কোনও কিছু নেই। আপনি যা বলতে চান, অসঙ্কোচে বলুন।

বিনয় বললে, আমার বাড়ির বিশ-পাঁচিশ হাত দূরে একটা বড়ো কাঁঠাল গাছ আছে। আমার দোতলার শোবার ঘর থেকে কাঁঠাল গাছটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সেই গাছটার একটা ডালে আজকাল মাঝে মাঝে একটা অদ্ভুত বাদুড় এসে বসতে শুরু করেছে।

—অদ্ভুত বাদুড়?

—আজ্ঞে হাঁ। সাধারণত বাদুড়দের স্বভাব, দুখানা পা দিয়ে গাছের ডাল ধরে নীচের দিকে মাথা করে ঝুলে থাকা। কিন্তু এ-বাদুড়টা ঠিক

পাখির মতোই ডালের উপরে বসে থাকে। কাজেই তাকে অদ্ভুত ছাড়া আর কী বলব বলুন?

—আজ কদিন থেকে বাদুড়টাকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন?

—প্রায় মাসখানেক ধরে। কিন্তু সে রোজ আসে না। একমাসের মধ্যে তিনদিন সে দেখা দিয়েছে, আর সেই তিনদিনই ছিল শনিবার। সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, সে দেখা দেয় ঠিক তখনই। আকারেও সে সাধারণ বাদুড়ের চেয়ে অনেক বড়ো—এত বড়ো বাদুড় আমি জীবনে কখনও দেখিনি।

—এই বাদুড়ের সঙ্গে রাজার কলকাতায় আগমনের সম্পর্ক কী?

সম্পর্ক হয়তো কিছুই নেই। কিন্তু তবু আগে আমার সব কথা শুনুন। কাঁঠাল গাছের ডালে বসে বাদুড়টা এক দৃষ্টিতে কেবল আমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে। বললে হয়তে আপনি বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তার চোখদুটোও ঠিক বাদুড়ের মতো নয়। দেখে আমার মনে হয়েছে, যেন ঠিক দুটো মানুষের চোখ উগ্র দৃষ্টিতে আমাকে নিরীক্ষণ করছে। আর সেই চোখদুটোও দেখতে যেন অবিকল রাজার চোখের মতো। রাজার চোখের মতো দেখতে বাদুড়ের চোখ-এ কথাটা হাস্যকর নয়?

অবিনাশবাবু কিঞ্চিৎ উত্তেজিতভাবে বললেন, না বিনয়বাবু, মোটেই হাস্যকর নয়! কী বললেন? মানুষের চোখের মতো দেখতে বাদুড়ের চোখ? আর সেই চোখদুটো কেবল তাকিয়ে থাকে। আপনার দিকেই?

—হাঁ অবিনাশবাবু। একেবারে নিস্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সেই সময় আমার কী মনে হয় জানেন? মনে হয়, কে যেন আমাকে বাড়ির বাইরে যাবার জন্যে প্রাণপণে আকর্ষণ করছে! কে যে আকর্ষণ করছে তা বুঝতে পারি না, কিন্তু মনের মধ্যে তার আকর্ষণকে রীতিমতো অনুভব করি। তখন ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি জানলার ধার থেকে সরে যাই। তারপর

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে, তখনও বাদুড়টা সেখানে থাকে কি না। আর বোঝা যায় না।

অবিনাশবাবু অত্যন্ত গভীর স্বরে বললেন, সাবধান বিনয়বাবু! হয়তো আপনাকে কেউ সম্মোহিত করবার চেষ্টা করছে। আপনার পক্ষে রাত্রে একলা রাস্তায় বেরুনো নিরাপদ নয়।

বিনয় বললে, আর একটা আশ্চর্য কথা শুনুন। গেল শনিবারে, রাত যখন তিনটে বেজে গেছে, হঠাৎ কার ডাকাডাকিতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বিছানার উপরে উঠে বসে শুনলুম। বাড়ির বাহির থেকে কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। আশু বলে আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছে, মনে হল তারই কণ্ঠস্বর। কিন্তু অবিনাশবাবু, বিশালগড় থেকে ফিরে আসবার পর থেকেই রাত্রে যা কিছু দেখি আর শুনি তাইতেই আমার মন সন্দিহান হয়ে ওঠে। ডাকের কথা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। গুরুজনরাও ছেলেবেলায় সাবধান করে দিতেন, রাত্রের কারুর ডাকে সাড়া দিতে নেই—অন্তত তিনবার ডাকবার আগে। হঠাৎ সেই কথাটাই আমার মনে হল। আমি সাড়া দিলুম না। কিন্তু কে ডাকছে, তা দেখবার জন্যে টার্চটা হাতে করে জানলার কাছে গেলুম। নীচে টর্চের আলো ফেলে কারুকেই দেখতে পেলুম না। কেবল শুনতে পেলুম, কঁঠাল গাছের একটা ডাল সশব্দে নড়ে উঠল। তারপরেই দুখানা বড়ো বড়ো পাখনার ঝটপট শব্দ। শূন্যে আলো ফেলে দেখি, মস্তবড়ো একটা বাদুড় উড়তে উড়তে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। পরদিন ভোরবেলাতেই আশুর বাড়িতে ছুটলুম। সেখানে শুনলুম যে কাল রাত্রে আমাকে ডাকতে আসবে কী, জ্বরের আক্রমণে আজ তিন দিন ধরে সে শয্যাগত হয়ে আছে। এ-সব কী ব্যাপার অবিনাশবাবু?

অবিনাশবাবু আবার কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, বিশালগড়ে যাবার সময় সরাইখানার সেই বুড়ি আপনাকে যে কবচখানা দিয়েছিলেন, সেখানা এখনও আপনার গলায় ঝোলানো আছে তো?

—আজ্ঞে না, কলকাতায় এসে সেখানা গলা থেকে খুলে রেখেছি।

অবিনাশবাবু তৎক্ষণাৎ ব্যস্তভাবে বললেন, সর্বনাশ, করেছেন কী! জানেন, সেই কবচের গুণেই বিশালগড় থেকে আপনি প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছেন ? বিশালগড়ের রাজা সত্যসত্যই যদি পিশাচ হয় তাহলে তার ভৌতিক দৃষ্টি এখনও আপনার উপরে নিবদ্ধ আছে। সে যখন স্বহস্তে আপনাকে স্পর্শ করেছে, তখন কলকাতায় এলেও আপনি খুব সহজেই আবার তার প্রভাবে গিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু ওই রক্ষাকবচখানি আপনার গলায় থাকলে সে আর কিছুতেই আপনাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। এখন আপনার প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বাড়ি ফিরে গিয়ে আবার সেই কবচ ধারণ করা। তারপর আর এক কথা। আজও তো শনিবার। আপনার যদি ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে সেই কাঁঠাল গাছে আজও বাদুড়ের আবির্ভাবের সম্ভাবনা। আমি আজ সন্ধ্যার আগে আপনার বাড়িতে যেতে চাই! আপনার আপত্তি নেই তো?

বিনয় খুশি হয়ে বললে, বিলক্ষণ! আপত্তি কী মশাই, এটা তো আমার পক্ষে সৌভাগেরই বিষয়!

দুই বাগানবাড়ির কোপ

সেইদিন সন্ধ্যার আগে। বিনয়ের শয়নগৃহ। অবিনাশবাবু ও বিনয়। সূর্য অস্তগত। ধীরে ধীরে ময়লা হয়ে আসছে দিনের আলো। আর মিনিট-কয়েক পরেই চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে যাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে। এখনই দৃষ্টির সামনে ভাসছে কেমন একটা ছায়াছায়া ভাব।

অবিনাশবাবু, ওই দেখুন!

সাগ্রহে দৃষ্টিচালনা করে অবিনাশবাবু দেখলেন, খানিক দূর থেকে উড়ে আসছে মস্ত বড়ো একটা কালো বাদুড়।

বাদুড়টা সোজা এসে কাঁঠাল গাছের একটা বড়ো ডালের উপরে চুপ করে বসে পড়ল। বিনয় বললে, দেখুন। আমার কথা সত্য কি না। আর এও দেখছেন তো, বাদুড়টা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার ঘরের দিকেই? ওর চোখদুটোও লক্ষ করুন!

অবিনাশবাবু আস্তে আস্তে বললেন, সবই দেখছি, সবই লক্ষ করছি। আপনি ঠিকই বলেছেন, ওর চোখদুটো মোটেই বাদুড়ের মতো নয়। বাদুড়ের চক্ষু-কোটরের ভিতর দিয়ে মানুষেরও দৃষ্টি ফুটে ওঠেনি—এ হচ্ছে কোনও অভিশপ্ত অমানুষের দৃষ্টি! ও-দৃষ্টি যার উপরে পড়বে তার সর্বনাশ না হয়ে যায় না!

বিনয় কাতর কণ্ঠে বললে, তাহলে এখন আমি কী করব?

—আজকেও কি কোনও আকর্ষণ আপনাকে বাইরে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে?

—না অবিনাশবাবু। আজ আমি সে-সব কিছুই অনুভব করছি না।

—সেই কবচখানা ধারণ করেছেন তো?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—জানবেন, ওই কবচ আপনার গলায় থাকলে কোনও দুষ্ট আত্মাই আর আপনাকে আকর্ষণ করতে পারবে না। আর একটা বিষয়েও আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই।

—কী বিষয়ে?

—আমি দেখতে চাই, ওই বাদুড়টার ভিতরে সত্য-সত্যই কোনও অপার্থিবতা আছে কি না।

—কেমন করে দেখবেন ?

—আপনার ওই কবচখানা বাহিরে বার করুন। তারপর ও-খানা হাতে করে তুলে ধরে একেবারে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ান। সত্যই যদি ওই কবিচের কোনও গুণ থাকে, তাহলে এখনই তার স্পষ্ট প্রমাণ আপনি নিজেই দেখতে পাবেন।

অবিনাশবাবুর কথামতো বিনয় কবচখানা বার করে জানলার ধারে গিয়ে সামনের দিকে তুলে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, যেন কোনও অদৃশ্য হাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে বাদুড়টা কাঁঠাল গাছের ডালের উপর থেকে নীচের দিকে ঠিকরে পড়ল। কিন্তু মাটিতে গিয়ে পড়বার আগেই সে আবার নিজেকে সামলে নিয়ে তিরবেগে আকাশের দিকে উঠে চলে গেল একেবারে চোখের আড়ালে।

অবিনাশবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আর আমার কোনওই সন্দেহ নেই। ওটা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সাধারণ বাদুড় নয়। আপনার কবচের শক্তি দেখলেন তো?

বিনয় অনুতপ্ত কণ্ঠে বললে, আপনার কথাই সত্য অবিনাশবাবু, কবচ খুলে ফেলে বিপদকে আমি যেচেই ডেকে আনতে চেয়েছিলুম। ভবিষ্যতে আর কখনও এমন কাজ করব না!

অবিনাশবাবু বললেন, ভবিষ্যতের কথা এখন থাক, আপাতত আমরা কী করব, তাই নিয়েই আলোচনা করা যাক। আপনার ধারণা, পিশাচ রাজা আবার কলকাতায় এসেছে ?

—আমার তো তাই ধারণা। ওই বাদুড়টা দেখে আপনারও মনে কি ওই রকম সন্দেহ জাগছে না?

—খালি সন্দেহ নিয়ে কোনও কাজই হবে না, আমি চাই স্পষ্ট প্রমাণ।

—কী রকম প্রমাণ?

—শুনুন। পিশাচ বা ভ্যাম্পায়ারের একটা বিশেষ স্বভাব আছে। দিনে তারা কোনও গোরস্থানের কবরে বা অন্য কোথাও লুকিয়ে ঠিক মৃতদেহের মতোই পড়ে থাকে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আবার হয় তাদের জাগরণ। তখন তারা জ্যান্ত মানুষের মতন লোকালয়ে গিয়ে শিকার খুঁজে বেড়ায়। সারা রাতটাই তাদের কেটে যায় এইভাবে। তারপর পূর্ব-আকাশে দিনের আলো ফোটবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তেই তারা আবার স্বস্থানে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। রাজা কলকাতায় এসেছে কি না, আর সে সত্য-সত্যই পিশাচ কি না, এটা আমরা অনায়াসেই আবিষ্কার করতে পারি।

—কেমন করে?

—আপনি তো ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাগানবাড়িটা চেনেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আজ রাত্রে আমার সঙ্গে আপনি সেখানে যেতে পারবেন ?

বিনয় শিউরে উঠে বললে, রাত্রে! সেই পোড়ো বাড়িতে!

—ভয় পাবেন না বিনয়বাবু, ভয় পাবার কিছুই নেই। স্মরণ রাখবেন, আপনার সঙ্গে আছে অব্যর্থ রক্ষাকবচ। ওই পোড়ো বাড়িটা হানাবাড়ি হলেও

কবচের গুণে আপনার কোনও ভয় নেই। আর আমারও কোনও ভয় নেই- কারণ, আমার সহায় মন্ত্রশক্তি। আমাদের মতন যারা প্রেততত্ত্ব নিয়ে কারবার করে, দুষ্ট আত্মাদের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যে সর্বদাই তাদের মন্ত্রশক্তির সাহায্য নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয়। তাহলে কী বলেন, আজ এই বাগানবাড়িতে গিয়ে রাত জগতে রাজি আছেন?

বিনয়ের মুখ দেখে মনে হল না যে সে বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছে। নাচারের মতন বললে, আপনি যখন বলছেন, তখন আমাকে যেতেই হবে।

অবিনাশবাবু বললেন, আপনার কোনও ভাবনা নেই। আমরা সেই বাগানবাড়ির ভিতরে প্রবেশ করব। আপনার মুখে শুনেছি, বাড়ির চারিদিকেই অনেকখানি জমি আছে। সুতরাং এটুকু অনুমান করতে পারি যে, সেই পোড়ো বাগানে ফুল আর ফলগাছ না থাক, ঝোপ-ঝাপ আগাছা আছে যথেষ্টই। তাই নয় কি?

—আজ্ঞে হাঁ। সেই জমির উপরে আছে দস্তুর মতো একটি জঙ্গল। ঝোপঝাপ খুঁজে নিতে একটুও দেরি লাগবে না।

—ব্যস, তাহলেই চলবে। পোড়ো জঙ্গলেই আজ আমরা রাত্রিবাস করব। মন্দ কী? এও একটা নুতনত্ব!

রাত্রি এখন যাত্রী হয়েছে প্রভাত-তীর্থে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে। কিন্তু প্রভাত আসন্ন হলেও এখনও ভোরের পাখিদের ঘুম ভাঙেনি এবং উষার শুভ্র ছোঁয়ায় এখনও হয়নি বিষণ্ন অন্ধকারের মৃত্যু। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ভাঙা বাড়ির পোড়ো বাগানের যেখানে আগে ছিল মস্তবড়ো ফটকটা, এখন তার কোনও চিহ্নই বিদ্যমান নেই। কিন্তু সেখান দিয়ে একটা পথ ভিতর দিকে অগ্রসর হয়ে বাড়ির দরজা পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

সেই পথের ধারেই ছিল এমন একটা প্রকাণ্ড ঝোপ যে, তার ভিতরে একটা হস্তীরও স্থানসঙ্কুলান হতে পারে। অবিনাশবাবুর সঙ্গে বিনয় আশ্রয় নিয়েছে সেই ঝোপটার মধ্যেই। বাহির থেকে কোনও দৃষ্টিই তাদের আবিষ্কার করতে পারবে না, কিন্তু ভিতর থেকে ঝোপের ফাঁক দিয়ে পথের উপরটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে তারা।

সারারাত শুকনো পাতা নড়লেই সাপের ভয়ে চমকে চমকে উঠে, এবং ঝাঁকে ঝাঁকে হৃষ্টপুষ্ট মশকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিনয়ের দেহ মন কাবু হয়ে পড়েছে একেবারে। অবিনাশবাবু কিন্তু এমন স্থিরভাবে বসে আছেন যে দেখলে মনে হয় না। তিনি একটামাত্র মশারও কামড় খেয়েছেন।

খুব দূরে কোথা থেকে একটা বড়ো ঘড়ি ঢং-ঢং করে পাঁচ বার বেজে উঠল।

অবিনাশবাবু আস্তে আস্তে বিনয়ে গায়ে ঠেলা মেরে বললেন, হুঁমিয়ার!

বিনয় আঁতকে উঠে বললে, কী হয়েছে অবিনাশবাবু?

—হবে। আর কী? এখানে সত্যিই যদি কোনও পিশাচ থাকে, তাহলে তার আসবার সময় হয়েছে। ওই দেখুন, রাত্রির অন্ধকার ক্রমেই পাতলা হয়ে আসছে, পূর্ব দিকের আকাশও এখন অনেকটা ফরসা। পিশাচের চোখ কোনওদিন উষার আলো পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না।

—আমাকে এখন কী করতে হবে?

—কিছু করতে হবে না, চোখ দুটোকে সজাগ রেখে খালি চুপ করে বসে থাকতে হবে।

ভোরের বাতাসের প্রথম ঝাপটা তাদের কপালের উপর বুলিয়ে দিয়ে গেল ভারী মিষ্টি একটি ঠান্ডা ছোঁয়া। কোনও গাছ থেকে ডেকে উঠল দুটো-একটা কাক।

—অবিনাশবাবু

—চুপ, ওইদিকে দেখুন!

হালকা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একটা সুদীর্ঘ মূর্তি বাগানের ভিতরে প্রবেশ করলে। মূর্তির দেহের কালো পোশাকটা অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় এক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার মুখের শুভ্রতা। মস্ত একজোড়া পাকা গোঁফের দুই প্রান্ত হওয়ায় দুলে দুলে উঠছে, বিনয় তাও দেখতে পেলে। মুখখানাকে ভালো করে চিনতে পারলে না বটে, কিন্তু জাঁদরেলি গোঁফজোড়া চিনে ফেলতে তার একটুও কষ্ট হল না। এই গোঁফের একমাত্র মালিক রাজা রুদ্রপ্রতাপ।

বাগানের ভিতরে ঢুকে মূর্তিটা ঝোপের ঠিক পাশের পথে এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। তার কী সন্দেহ হল জানি না, কিন্তু সে যখন ফিরে ফিরে এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিচালনা করছিল, তখন তার দুই চক্ষে জ্বলে জ্বলে উঠছিল যেন তীব্র বিদ্যুতের শিখা।

আচম্বিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে অমানুষিক কণ্ঠে মূর্তিটা করে উঠল ভয়াবহ অট্টহাস্য। বিনয় সভয়ে অবিনাশবাবুর একখানা হাত দুই হাতে চেপে ধরলে এবং অবিনাশবাবুও খানিকটা স্তম্ভিতের মতন হয়ে গেলেন। এমন অট্টহাসি মানুষের কর্ণ বোধহয় কোনওদিনই শ্রবণ করেনি। তেমনি হা হা হা হা হা হা হাসতে হাসতে মূর্তিটা দ্রুতপদে বাড়ির দিকে প্রায় ছুটে চলে গেল। তারপর শোনা গেল দরজা খোলার ও দুম করে বন্ধ হবার শব্দ।

বিনয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, অবিনাশবাবু! ও অমন করে হাসলে কেন?

—হয়তো আমাদের অস্তিত্ব জানতে পেরেছে।

—কিন্তু তবুও তো আমাদের আক্রমণ করলে না?

—ভোরের পাখি ডেকে উঠেছে। ওর আর কোনও শক্তিই নেই।

আবার নতুন খবর

পরদিনের বেলা সাড়ে দশটা।

বিনয় হন্তদন্তের মতো অবিনাশবাবুর বৈঠকখানায় এসে হাজির, তার হাতে একখানা খবরের কাগজ ।

গতকল্যকার নিশা-জাগরণের পর আজ অবিনাশবাবুর ঘুম ভেঙেছিল বেশ একটু বেলায়। প্রথম চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় বিনয়কে দেখে বিস্মিত স্বরে তিনি বললেন, ব্যাপার কী! আপনার মুখের ভাব তো সন্তোষজনক বলে মনে হচ্ছে না?

বিনয় একখানা চেয়ারের উপরে বসে পড়ে বললে, আপনার কথার উত্তর না দিয়ে আমি এই খবরের কাগজখানা পাঠ করতে চাই।

—আবার খবরের কাগজ! কাল কি আবার নতুন কোনও মানুষ রক্তশূন্যতা রোগে মারা পড়েছে?

—'শুনুন।' এই বলে বিনয় খবরের কাগজখানা পাঠ করতে লাগল।

"কলিকাতায় ভ্যাম্পায়ার বাদুড়"

অনেকেই এতদিন যে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছিলেন, কাল রাত্রে তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে। ইয়াঙ্কি মুলুকের ভ্যাম্পায়ার বাদুড় দেখা দিয়াছে ভারতের প্রধান নগর কলিকাতায়।

পুলিনবিহারী বসু শ্যামবাজার অঞ্চলে বাস করেন। তিনি একজন কারবারি লোক। গতকল্য সন্ধ্যার পর আহারাদি সম্পন্ন করিয়া তিনি নিজের শয়নগৃহে গমন করেন। তাহার পর যথাসময়ে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। তাঁহার স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন না, নিজের কোনও আত্মীয়ের বাড়ি বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রায় মধ্যরাত্রে তিনি আবার বাড়িতে ফিরিয়া আসেন। পুলিনবাবু সেদিন শয়নগৃহের দরজা কেবল ভেজাইয়া রাখিয়াছিলেন, স্ত্রী আসিলে দরজার অর্গল খালিবার জন্য পাছে তাঁহার নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, সেই ভয়েই ভিতর হইতে তিনি দরজা বন্ধ করেন নাই।

তাঁহার স্ত্রী দরজা ঠেলিয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ঘরের আলো জ্বলাই ছিল, এবং সেই আলোতে তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন ভয়াল এক দৃশ্য।

প্রকাণ্ড একটা কৃষ্ণবর্ণের কী জীব তাঁহার নিদ্রিত স্বামীর দেহের উপরার্ধ প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া শয্যার উপরে স্থির হইয়া আছে। সেই দৃশ্য দেখিয়াই তিনি প্রাণপণে চিৎকার করিয়া উঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবটা তাঁহার স্বামীর দেহের উপর হইতে উঠিয়া জানালার ভিতর দিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া ডানার ঝটপট শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়। তখন বুঝিতে পারা যায় যে জীবটা বাদুড় ছাড়া আর কিছুই নয়।

পুলিনবাবুর স্ত্রী বিছানার পার্শে আসিয়া দেখিলেন, তখনও তাঁহার স্বামীর নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই এবং তাঁহার কণ্ঠদেশের উপর হইতে ঝরিয়া

পড়িতেছে রক্তের ধারা। তাহার পর অনেক চেষ্টা করিয়াও স্বামীর নিদ্রা ভাঙিতে না পারিয়া পুলিনবাবুর স্ত্রী ডাক্তারের বাড়িতে খবর পাঠান।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষার পরে বলেন, পুলিনবাবু জীবিত আছেন বটে এবং তাঁহার প্রাণেরও কোনও আশঙ্কা নাই, তবে রক্তশূন্যতার জন্য অত্যন্ত নির্জীবী হইয়া পড়িয়াছেন।

যদিও এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ এখনও আমরা পাই নাই, তবু যতটুকু প্রকাশ পাইয়াছে তারই উপর নির্ভর করিয়া আমরা বলিতে পারি, ইহার আগে কলিকাতায় গত এক মাসের মধ্যে উপরি-উপরি সাত-সাতজন লোকের যে রহস্যময় মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সহিত এই ঘটনার নিশ্চয়ই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ওই সাতজন লোকও মারা পড়িয়াছে রক্তশূন্যতার জন্য। পুলিনবাবুও যে ঠিক এই কারণেই মৃত্যুমুখে পড়িতেন সে বিষয়ে কোনওই সন্দেহ নাই। তাঁহার স্ত্রীর আকস্মিক আগমনের জন্যেই এ-যাত্রা তিনি রক্ষণ পাইয়াছেন।

মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এইসকল দুর্ঘটনার জন্য দায়ী আমেরিকার ভ্যাম্পায়ার বাদুড়। যেকোনও উপায়েই হউক, এক বা একাধিক ওই জাতীয় জীব কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

যে তাঁহার স্বামীর দেহের উপরে একটা প্রকাণ্ড কালো বাদুড় স্থির হইয়া পড়িয়া আছে। এবং এই বাদুড়টাই যে পুলিনবাবুর রক্ত শোষণা করিতেছিল, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এতদিন পরে উত্তর-কলিকাতার এই বিচিত্র রহস্যের একটা সমাধান হইল। কিন্তু এখন একটা বড়ো প্রশ্ন হইতেছে এই যে, কোন উপায়ে ওই ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ের কবল হইতে শহরবাসীরা উদ্ধার লাভ করিবে? কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর দাবি করিতেছি।

সমস্ত শুনে অবিনাশবাবু আগে নীরবে খালি করলেন চায়ের পেয়ালাটা। তারপরে বললেন, কাগজওয়ালাদের বিশ্বাস, এতদিন পরে সব রহস্যের সমাধান হয়েছে। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়ও দেখা গিয়েছে, আর সাতজন লোকের মৃত্যুর কারণও জানতে নাকি কারুর বাকি নেই। কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব আমরা মানুষ, আসল রহস্যের কতটুকু খবরই বা আমরা রাখতে পারি? ভ্যাম্পায়ার বাদুড়! রাবিশ! আসল কথা জানতে পারলে শহরবাসীদের নাড়ি একেবারে ছেড়ে যাবে!'

বিনয় কাতর মুখে বললে, অবিনাশবাবু, কলকাতাবাসীদের মাথার উপরে কী ভীষণ বিপদের খাড়া ঝুলছে, এটা তো এখন আপনি বুঝতে পেরেছেন? আপনি কি চেষ্টা করলে এই বিপদ দূর করতে পারেন না?

অবিনাশবাবু বললেন, পারি বিনয়বাবু, পারি। চেষ্টা করলে হয়তো চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরেই আমি ওই পিশাচ রাজার সব লীলাখেলা সাঙ্গ করে দিতে পারি।

—তবে সেই চেষ্টাই করুন অবিনাশবাবু, সেই চেষ্টাই করুন!

অবিনাশবাবু ভাবতে ভাবতে ধীরে ধীরে বললেন, ব্যাপারটা একটু ভালো করে বোঝাবার চেষ্টা করুন। পুলিশের কাছ থেকে আমরা কোনওই সাহায্য পাব না, কারণ পুলিশ কোনওদিনই ভূত-প্রেত, পিশাচ, দৈত্য বা দানব নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি হবে না। আমাদের মুখে সব কথা শুনলে তারা আমাদের তাড়াতাড়ি পাঠাতে চাইবে পাগলা গারদে। সুতরাং পুলিশের কথা একেবারেই ভুলে গিয়ে আমাদের দুজনকে কাজ করতে হবে খুব গোপনে আর স্বাধীনভাবে।

—হ্যাঁ অবিনাশবাবু, আপনার এ অনুমান মিথ্যা নয়।

—বিনয়বাবু, কাল রাতে আপনি ছিলেন বিনিদ্র। আজকেও কি সারারাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকতে পারবেন?

—কেন বলুন দেখি?

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সূর্যোদয়ের পরেই পিশাচ রাজা ওই বাড়ির ভিতরে কোনও এক জায়গায় নির্জীবী হয়ে পড়ে থাকে, সন্ধ্যার আগে তার দেহে আর জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। দিনের বেলায় তার অবস্থা হয় একান্ত অসহায়ের মতন; আক্রান্ত হলেও সে কিছুতেই আত্মরক্ষা করতে পারে না। পিশাচকে বধ করবার উপায় আমার অজানা নেই। দিনের বেলায় একবার তাকে হাতে পেলেই তার কবল থেকে তখনই পৃথিবীকে মুক্তি দিতে পারি।

—এ জন্যে রাত জাগবার দরকার কী, অবিনাশবাবু? কাল সকালেই তো সূর্যোদয়ের পরে আমরা ওই বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকতে পারি?

—বিনয়বাবু, আপনি ছেলেমানুষের মতন কথা বলছেন। বাগানবাড়ির মালিদের ঘরে একদল বেদেকে কি আপনি স্বচক্ষে দেখেননি? ওরা কেন যে ওখানে আছে, তাও কি বুঝতে পারছেন না? ওরা হচ্ছে রাজার মাহিনা-করা অনুচর; বাড়ির উপরে পাহারা দেবার জন্যেই রাজা ওদের নিযুক্ত করেছে। রাজা নিজেও জানে, দিনের বেলায় সে হয় অত্যন্ত অসহায়! তাই সেই সময় বাড়ির চারিদিকেই থাকে বেদেদের কড়া পাহারা। আমরা কেমন করে তাদের চোখে ধুলো দেব? অতএব দিনের কথা ভুলে গিয়ে ওই বাগানবাড়িতে যেতে হবে রাত্রির অন্ধকারে গা ঢেকে। বাড়িখানা আমিও দেখেছি। প্রকাণ্ড বাড়ি। চোরের মতন বাড়ির ভিতর ঢুকে, আনাচে-কানাচে বা কোনও একখানা ঘরের ভিতরে লুকিয়ে বসে আমরা দুজনে

সূর্যোদয়ের অপেক্ষা করব। তারপর পিশাচ যখন হবে জড় পদার্থের মতো, তখন আমরা তার দেহটিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করব।

—কিন্তু যে সময় আমরা ওই বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকব, রাজা যদি তখন সেইখানে উপস্থিত থাকে?

—রাত্রে সেখানে রাজার উপস্থিতির সম্ভাবনা খুবই অল্প। সাধারণত পিশাচরা সূর্যাস্ত হলেই শিকারের সন্ধানে যাত্রা করে। আমাদের বিশ্বাস, অলৌকিক শক্তির গুণে রাজা বাদুড়ের আকার ধারণ করতে পারে। যে কালো বাদুড়টা আপনাকে জ্বালাতন করতে যেত, সেটা যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হবার আগেই সেই কাঁঠাল ডালে গিয়ে বসত, এরই মধ্যে এ কথা কি আপনি ভুলে গিয়েছেন?

বিনয় একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, না, তুলিনি অবিনাশবাবু। আপনার মতোই অভ্রান্ত বলে বোধ হচ্ছে। যদিও সেই প্রেতপুরীর মধ্যে রাত্রি যাপন করবার কথা মনে করেই আমার বুকটা ধড়াস করে উঠেছে, তবুও মানুষের এই মহাশত্রুকে বধ করবার জন্যে সমস্ত বিপদকেই আমি তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে পারি।—তাহলে এই কথাই রইল অবিনাশবাবু। কখন আমরা ওই বাগানবাড়ির দিকে যাত্রা করব?

—রাত বারোটার পর।

যম থাকে যমালয়ে

রাত যখন একটা, প্রগাঢ় অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তারা উপস্থিত হল সেই বাগানবাড়িখানার কাছে। অন্ধকারের মধ্যে দীপ্ত জোনাকিদের দেখাচ্ছে অশরীরীদের ভূতুড়ে আলোফুলের মালার মতো। ঝিল্লিদের

ঝঙ্কারও শোনাচ্ছে কেমন যেন অস্বাভাবিক, ইহলোকের কানে কানে যেন শোনাতে চায় পরলোকের কর্‌কশ সঙ্গীত। বাতাসে বাতাসে গাছে গাছে জাগছে যে পত্রমর্মর, তাও যেন অভিশপ্ত আত্মাদের করুণ দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। রাত্রে পৃথিবীর উপর অন্ধকারের যবনিকা নেমে এলে সৃষ্টির প্রভাত থেকে মানুষের মনের ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে আসছে এক অবর্ণনীয় অপার্থিব ভাব। তখন সহজ বস্তুকেও আর সহজ বলে মনে হয় না, অন্ধদৃষ্টি আর কিছুই দেখতে না পেলেও কল্পনায় চারিদিকেই দেখে বা দেখছে বলে সন্দেহ করে। রহস্যময় আতঙ্ক আর আতঙ্ক ।

অবিনাশবাবু বললেন, বিনয়বাবু, আপনি এমন বোবার মতন চুপ করে আছেন কেন? আপনার ভয় হচ্ছে নাকি?

বিনয় বললে, ভয় যে হচ্ছে না, কেমন করে বলি? এখন আমি চারিদিকেই দেখছি সেই ভয়ানক রাজার মূর্তি! প্রত্যেক ঝোপঝাপ নড়ে নড়ে উঠছে আর আমার মনে হচ্ছে, রাজা বুঝি টের পেয়েছে আমাদের অস্তিত্ব। আমরা হচ্ছি আলোর ভক্ত, আর রাজা হচ্ছে অন্ধকারের জীব। এই নিশাচর যে আমাদের অনুসরণ করছে না, কিছুতেই আমি মনে করতে পারছি না এই কথাটা।

— কিন্তু আপনাকে তো আমি বারবার বলছি যে ওই কবচ সঙ্গে থাকতে আপনার কোনওই আশঙ্কা নেই?

—জনি অবিনাশবাবু, জানি। দুর্বল মন তবু সহজে প্রবোধ মানতে চায় না।

বিনয়কে সন্ত্বনা দেবার জন্যে তার হাত ধরে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে অবিনাশবাবু বললেন, আচ্ছা, আগেও তো আপনি এই বাড়িখানা দেখেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। এ বাড়ির ভিতর-বহির, সবই আমার দেখা।

—খুব সম্ভব বাড়ির সদর দরজাটা বাহির থেকে তালাবন্ধ করে রেখেছে। এই বাড়িতে ঢোকবার আর কোনও উপায় আপনি জানেন?

—বাড়ির পিছনে দেখেছিলুম পাল্লাহীন একটা খিড়কির দরজা। সেখান দিয়ে অনায়াসেই ভিতরে প্রবেশ করা যায়।

—বেশ, তাহলে ওই পথই আমরা অবলম্বন করব। বেদেদের কোনওই সাড়া নেই। আর এত রাত্রে তাদের সাড়া থাকবার কথাও নয়। তারা জানে, তাদের রাজা বেরিয়েছে এখন নৈশ বিহারে, অতএব বাড়ির উপরে আর পাহারা দেবার দরকার নেই। নিশ্চয়ই তারা এখন নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে। আসুন বিনয়বাবু।

অন্ধকার হাতড়াদে বার কয়েক হোঁচট খেয়ে তারা উপস্থিত হল বাড়িখানার পিছন দিকে।

অন্ধকার যেখানে ঘন নয় এমন একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বিনয় বললে, ওইখানে আছে একটা পানায় সবুজ মস্ত বড়ো পুরোনো পুকুর। আর এইদিকে আছে খিড়কির সেই ভাঙা দরজাটা।

দ্বারপথ আবিষ্কার করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। ভিতরে ঢুকে অবিনাশবাবু বললেন, আর কোনও অযাচিত লোককে ভয় করবার কারণ নেই। এইবারে আমরা টর্চ জ্বেলে একটা গাঢাকা দেবার মতো জায়গা খুঁজে বার করতে পারি।

টর্চের চাবি টিপে আলো জ্বেলে দুজনে অগ্রসর হতে লাগল। তাদের চারিদিকেই দেখা যাচ্ছে প্রায় ধ্বংসস্তুপের মতো জীর্ণ বাড়ির আগাছাভিরা উঠেন, দালানের ভেঙে-পড়া খিলানের পর খিলান, ধসে-পড়া সোপান ও হেলে-পড়া দেওয়ালের উপর ঝুলে-পড়া কড়ি ও বরগা। এক

জায়গা থেকে তাদের পদশব্দ শুনে দুটো শেয়াল বেগে ছুটে পালিয়ে গেল। একাধিক সর্পেরও সন্ধান পাওয়া গেল। একটি ঘরের ভিতর কী রকম ঝটপট ঝটপট শব্দ। উপর দিকে আলো ফেলে শুকনো গলায় বিনয় বলে উঠল, বাদুড়?

সে ভয়ে ভয়ে পিছিয়ে আসছিল, কিন্তু অবিনাশবাবু তার কাঁধের উপর হাত দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, ও-রকম ছোটো বাদুড় দেখে আপনি আঁতকে উঠলেন কেন? ওটা তো সাধারণ বাদুড় ছাড়া আর কিছুই নয়।

আর একটা ঘরে ঢুকেই তারা শুনতে পেলে বিকট কণ্ঠের কয়েকটা অদ্ভুত চিৎকার। বিনয়ের সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হয়ে উঠল এবং যেন খাড়া হয়ে উঠল তার মাথার চুলগুলো পর্যন্ত।

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, ও তক্ষক, কোনও ভয় নেই।

তারপর তারা প্রবেশ করলে খুব বড়ো একটা ঘরের ভিতরে। সে ঘরখানার অবস্থা অন্যান্য ঘরের মতন শোচনীয় ছিল না, যদিও তার মেঝের উপরে জমে আছে বহুকালের সঞ্চিত ধুলো এবং তার দেওয়ালের গা থেকেও খসে পড়েছে চুন-বালির প্রলেপ, তবু চেষ্টা করলে সে ঘরখানাকে এখনও মানুষের ব্যবহারযোগ্য করে নেওয়া যায়।

সেই ঘরেরই এক কোণে দেখা গেল প্রকাণ্ড একটা সিন্দুক। সেটা দেখেই চমকিত চক্ষে বিনয় বলে উঠল, ওই সিন্দুকটাকেই আমি দেখেছি বিশালগড়ে! দিনের বেলায় রাজা মড়ার মতন শুয়ে থাকে ওরই ভিতরে!

অবিনাশবাবু এগিয়ে গিয়ে সিন্দুকের ভারী ডালাটা খুলে ফেলে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, সিন্দুকের ভিতরে দেখছি বিছানার বদলে রয়েছে রাশীকৃত স্যাতসেঁতে মাটি। হ্যাঁ, পিশাচেরই উপযুক্ত শয্যা বটে! দিনের বেলায় পিশাচ শুয়ে থাকতে চায় কবরের ভিজে মাটির

বিছানায়। এখানে পিশাচ কবরের বদলে ব্যবহার করেছে একটা সিন্দুককেই, কিন্তু নিজের স্বভাব ভুলতে না পেরে নগ্ন মাটির উপরেই শয্যা রচনা না করে পারেনি।

বিনয় নিজের হাতের ঘড়ি দেখে বললে, রাত তিনটে বেজেছে। রাজার আসতে এখনও অনেক দেরি।

কিন্তু তার কথা ফুরোতে না ফুরোতেই সেই প্রকাণ্ড ঘরটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। পৈশাচিক অট্টহাসির তরঙ্গে।

দুজনেই বিদ্যুতের মতো ফিরে দেখে, কখন নিঃশব্দপদে রাজা এসে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে আছে ঠিক সেই ঘরের মাঝখানে।

রাজা হাসতে হাসতে হঠাৎ হাসি থামিয়ে ফেলে বজ্রের মতন কঠিন স্বরে চিৎকার করে। বললে, 'ক্ষুদ্র মানুষ! তোরা যে আজ এইখানে আসবি, কালকেই আমি তা অনুমান করেছিলুম। তোরা হচ্ছিস নশ্বর, দুনিয়ায় এসেছিস দুদিনের পরমায়ু নিয়ে! কতটুকু তোদের বুদ্ধি? আমি হচ্ছি অমর, আজ তিন শতাব্দী ধরে এই পৃথিবীর বুক মাড়িয়ে আমি বিচরণ করছি দিগ্বিদিকে-আমার মনের মধ্যে আছে তিন শতাব্দীকালের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা! এত বড়ো দুঃসাহস তোদের, আমার সঙ্গে করতে চাস প্রতিদ্বন্দ্বিতা? তোদের সমস্ত উচ্চাকাঙক্ষা আজ লুপ্ত করে দেব আমি এই মুহূর্তেই!' দুই ক্রুদ্ধ চক্ষে দুটো দপদপে শিখা জ্বলিয়ে রাজা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে—সামনে সুদীর্ঘ বাহু বাড়িয়ে।

ভয়ে, দুশ্চিন্তায় বিনয়ের মুখ হয়ে গেল মড়ার মতো পাণ্ডুর। পায়ে পায়ে সে-ও পিছোতে লাগল, চমকে উঠতে উঠতে।

অবিনাশবাবু কিন্তু নিশ্চল। তাঁর নেই এতটুকু ভয়ের লক্ষণ। স্থির গভীর স্বরে তিনি বললেন, নির্ভয় হোন বিনয়বাবু! আপনার অস্ত্রের কথা আবার ভুলে গেলেন? শিগগির বার করুন সেটা!

বিনয় কাঁপতে কাঁপতে নিজের জামার তলা থেকে টেনে বার করে ফেললে গলায় ঝোলানো সেই কবচখানা।

বিকট আর্তনাদ করে রাজা তখনই ঘুরে মাটির উপরে পড়ে গেল বিদ্যুতাহতের মতো। তারপর চোখের পলক পড়তে-না-পড়তেই আবার উঠে ঝড়ের মতো বেগে ঘরের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিনয়ের হাত ধরে টানতে টানতে অবিনাশবাবুও ছুটলেন ঘরের বাইরে।

উঠোনের উপর আবার দেখা গেল পলাতক রাজার ছুটন্ত মূর্তি।

অবিসাশবাবু দৌড়তে দৌড়তে চেঁচিয়ে বললেন, ভয় পাবেন না বিনয়বাবু, ছুটে চলুন আমার সঙ্গে! পিশাচ এখন শক্তিহীন। আমাদেরই ভয়ে সে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়। ওই কবচ একবার যদি ওর গায়ে স্পর্শ করাতে পারি, তাহলে এখনই ও মূর্ছিত হয়ে আমাদের হস্তগত হবে। তারপর? তারপর যা করবার, আমিই করব।

রাজার মূর্তি বৃদ্ধের মতো বটে, কিন্তু তার দেহে আছে যেন একাধিক যুবকের প্রবল শক্তি। অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতিতে কখনও রাশীকৃত ইষ্টকস্তূপের উপর লাফ মেরে এবং কখনও বা মাটির উপর দিয়ে দ্রুতগামী হরিণের মতো ছুটতে ছুটতে ক্রমেই সে দূরে চলে যেতে লাগল। খিড়কির ভাঙা দরজা দিয়ে অবিনাশবাবুর সঙ্গে বিনয়ও বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলে, সেই পানীয়-ভরা পুকুরের জলের ভিতরে কে যেন ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

তারপর শোনা গেল সাঁতার কাটতে কাটতে জলে ছুপুছপ শব্দ তুলে কে ওপারের দিকে চলে যাচ্ছে।

অবিনাশবাবুও পুকুরের ডান পাড়ের উপর দিয়ে দৌড়ে ওদিকে যাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু হঠাৎ পায়ে গাছের শুকনো শিকড়ের মতো কী-একটা জিনিসের বাধা পেয়ে মাটির উপরে সটান পড়ে গেলেন। বিনয় তাড়াতাড়ি তাঁকে তুলে আবার বসিয়ে দিলে। তখন জলের উপরে সাঁতারের শব্দ থেমে গিয়েছে, এবং পরমুহূর্তেই জেগে উঠল আর একটা নূতন শব্দ।

শূন্যে বাদুড়ের ডানার ঝটপটানির শব্দ।

ক্রুদ্ধ মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে অবিনাশবাবু বললেন, রাজা আবার আমাদের নাগালের বাইরে। ওই দেখুন।

একটা অবস্তব প্রকাণ্ড কালো বাদুড় দুই দিকে দুখানা ডানা বিস্তৃত করে আকাশের গায়ে উড়ে যাচ্ছে উপরে-আরও উপরে।

পরদিনের গভীর রাত্রি।

অবিনাশবাবু ও বিনয় আবার সেই বাগানবাড়িতে।

কিন্তু সেই বড়ো ঘরে প্রবেশ করে দেখা গেল, মস্ত সিন্দুকটা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

বিনয় মাথা চুলকোঁতে চুলকোতে বললে, অবিনাশবাবু, পাখি কি উড়েছে?

—পাখি যে উড়েছে, সেটা তো কাল স্বচক্ষেই আমরা দেখেছি। আপনার কবচ তার সহ্য হবে না।

—বেদেরা?

—পাখির বাসা আছে সেই সিন্দুকে। বেদেরা নিশ্চয়ই বাসা নিয়ে ফিরে গেছে বিশালগড়েই।

—এখন উপায়?

—আমাদেরও যেতে হবে বিশালগড়ে!

—বলেন কী, আবার সেই মারাত্মক জায়গায়?

—যমকে খুঁজতে গেলে যমালয়েই যেতে হয়।

আবার বিনয়ের ডায়েরি

বিশালগড়ের বিপুল অরণ্যের প্রান্তে আবার সেই সরাইখানায়। এবং আমাকে দেখে সচকিত বিস্ময়ে সর্বপ্রথমে অভ্যর্থনা করতে এলেন আবার সেই প্রাচীন নারী।

বললেন, বাছা, সেবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েও আবার আপনি এখানে এসেছেন?

আমি সহাস্যে বললুম, মায়ীজি, আপনার দেওয়া রক্ষাকবচ যখন আমার গলায় ঝুলছে, তখন যমকেও আমি ভয় করি না। কিন্তু এবারে আমি একলা আসিনি, আমার সঙ্গে এসেছেন বন্ধুটিও।

প্রাচীন অবিনাশবাবুর মুখের দিকে এবার কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, এঁরও গলায় কোনও রক্ষাকবচ আছে কি?

—না মা, এর কোনও কবচের দরকার নেই। এর কারবারই হচ্ছে ভূত-প্রেত নিয়ে খেলা করা।

—ও, উনি বুঝি রোজা ?

অবিনাশবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আপনার কথাই সত্য। এক হিসাবে আমি রোজাই বটে, তবে, আমি হচ্ছি অতি-আধুনিক রোজা।

প্রাচীনা আশ্বস্ত হয়ে বললেন, তাহলে বাবুজি, আপনাদের জন্যে আমার আর কোনও চিন্তা নেই। কিন্তু আপনাদের আবার এখানে আসবার কারণ কী?

আমি বললুম, আমরা এসেছি রাজা রুদ্রপ্রতাপের অস্তিত্ব লুপ্ত করতে।

প্রাচীনা বিস্মিত মুখে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন, কিন্তু বাবুজি, রাজা তো বিশালগড়ে নেই।

আমি বললুম, রাজা কলকাতায় গিয়েছিলেন। কিন্তু কাল রাত্রেই তিনি আবার কলকাতা ত্যাগ করেছেন। বিশালগড় ছাড়া তাঁর যাবার আর কোনওই জায়গা নেই। আমাদের মতন তাঁরও আজকে এখানে আসার কথা।

প্রাচীনা বললেন, কিন্তু এখনও তিনি এখানে আসেননি।

অবিনাশবাবু বললেন, এ কথা। আপনি কেমন করে জানলেন?

প্রাচীনা বললেন, বাবুজি, বিশালগড়ে যেতে আর সেখান থেকে বাইরে আসতে হলে পথ আছে একটি মাত্র। সে পথ এসে পড়েছে ঠিক এই সরাইখানার সামনেই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, রাজা বিশালগড়ে ফিরে গেলে আমরা নিশ্চয়ই তাঁকে দেখতে পেতুম।

অবিনাশবাবু বললেন, আপনি যখন রাজার সব খবর রাখেন, তখন এটুকুও নিশ্চয় জানেন যে ইচ্ছা করলে তিনি রূপান্তর গ্রহণ করতে পারেন?

ভয়ে ভয়ে একবার চারিদিকে তাকিয়ে প্রাচীনা চুপি-চুপি বললেন, এত জোর গলায় রাজার কথা নিয়ে আলোচনা করবেন না! এখানে বনের

গাছ-পাতা আর বাতাসেরও বোধহয় কান আছে, রাজার কথা তারা সব শুনতে পায়। রাজা যদি একবার জানতে পারেন যে তার কথা নিয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে এইভাবে আলাপ করছি, তাহলে আমার জীবনের মূল্য হবে না একটিও কানাকড়ি। হ্যাঁ বাবুজি, আমি শুনেছি যে মাঝে-মাঝে বন থেকে এমন সব নেকড়ে বেরোয়, আর আকাশ দিয়ে উড়ে যায় এমন এক মস্ত বাদুড়, যাদের আত্মার সঙ্গে নাকি রাজার আত্মার কোনওই তফাত নেই। অবশ্য, এটা সত্যি কি মিথ্যা কথা আমি তা জানি না।

অবিনাশবাবু বললেন, কাল কলকাতায় প্রায় শেষ রাতে আমরা রাজাকেই দেখেছি বোধহয় বাদুড়রূপে। রাজা যদি শূন্য পথে বিশালগড়ে গিয়ে হাজির হন?

প্রাচীন একটু ভেবে বললেন, কাল প্রায় শেষ রাতে রাজা যদি সত্য-সত্যই বাদুড়-মূর্তি ধারণ করে থাকেন, তাহলে শূন্যে উড়েও তিনি ভোরের আগে এতটা পথ পার হতে পারবেন না।

—আপনি কী বলতে চান?

—লোকে বলে, সূর্যোদয় হলেই রাজা হন মড়ার মতো। সে ক্ষেত্রে তাঁকে বিশালগড়ে আসতে হবে অন্য লোকের সাহায্যে পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে।

—রাজাকে সাহায্য করতে পারে, এমন সব লোকও আছে নাকি?

—আছে বইকি বাবুজি! কিন্তু তারা এ অঞ্চলের কোনও ভালো লোক নয়। তারা হচ্ছে বিদেশি বেদে। রাজার কথায় তারা ওঠে-বসে। কিন্তু রাজার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিশালগড় থেকে অদৃশ্য হয়েছে। কিছুদিন আগে আমি দেখেছি, তারা একটা ভারী সিন্দুকু মাথায় করে বনের ভিতর থেকে

বেরিয়ে ইস্টিশনের দিকে চলে গেল। তার পর থেকে এখন পর্যন্ত আর তাদের দেখা পাইনি।

বিনয় বললে, সেই সিন্দুকের রহস্য আপনি জানেন?

প্রাচীনা কেমন শিউরে উঠে বললেন, লোকে নানান আজগুবি কথা বলে, আমি ঠিক জানি না।

—বেদেরা সেই সিন্দুকটা নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিল। কিন্তু কাল রাজার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুক-সুদ্ধ সেই বেদেদেরও আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেদেরা সেই সিন্দুকটা নিয়ে কোথায় যেতে পারে, আপনি বলতে পারবেন কি?

—রাজার মতো ওই বেদেরাও হচ্ছে বিশালগড়ের জীব। সিন্দুক নিয়ে তারা সেখানে ছাড়া আর কোথাও যাবে বলে মনে হয় না।

অবিনাশবাবু হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, সিন্দুকনিয়ে বেদেরা এখনও বিশালগড়ে ফিরে যায়নি?

—হ্যাঁ বাবুজি, এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছুই নেই।

—জয় গুরু! বেদেরা তাহলে এখনই বা একটু পরেই সিন্দুকনিয়ে এই পথে ফিরে আসবে।

আমি বললুম, আপনি এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কেন?

—কেন? আরে, আপনি কি এও বুঝতে পারছেন না যে, বেদেরা এই সিন্দুকনিয়ে আমাদেরই মতো রেলপথে এইখানে আসবে? কলকাতা থেকে বিশালগড়ে আসবার ট্রেন আছে মাত্র একখানা। যদিও আমরা তাদের দেখতে পাইনি, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে এখানে এসে পৌঁছেছি। তারা বহন করে আনছে একটা মস্ত ভারী সিন্দুক, তাই আমাদের আগে

এখানে এসে হাজির হতে পারেনি। কিন্তু তারা এল বলে। চলুন বিনয়বাবু, তাদের আগেই আমরা বিশালগড়ে গিয়ে উপস্থিত হতে চাই।

প্রাচীনা বললেন, বাবুজি, এতদূর থেকে আসছেন, আপনারা কি দয়া করে এখানে একটু বিশ্রামও করবেন না?

আমি বললুম, প্রণাম মায়ীজি, আজ আর আমাদের বিশ্রামের সময় নেই। যদি ভালোয় ভালোয় ফিরে আসি, আবার এখানে এসে বিশ্রাম করব। চলুন অবিনাশবাবু।

গোলাপি, বেগুনি, নীল আলো

সন্ধ্যা। কিন্তু আজকের সন্ধ্যা নয় চন্দ্রহীন। চারিদিক ছন্দোময় হয়ে আছে জ্যোৎস্নার মৌন আলোক-সঙ্গীতে।

আবার সেই বিশালগড়ের অসমোচ্চ পথের উপরে। দুইদিকে তার গহন অরণ্য, নৃত্যশীলা তটিনী, ছবির মতো সুন্দর পাহাড়ের পর পাহাড়। সেদিন ছিল অন্ধকারের বিভীষিকা, কিন্তু আজ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে গীতিকবিতার ঐশ্বর্য।

এইসব দেখতে দেখতে অবিনাশবাবুকে নিয়ে আমি এগিয়ে চললুম আগে আগে। আজ আমি নির্ভয়, কারণ কবচের মহিমা আমাকে করে তুলেছে পরম সাহসী। রুদ্রপ্রতাপ আজ যদি একেবার আমার সামনে এসেও দাঁড়ায় তাহলেও আমি পশ্চাৎপদ হব না এক ইঞ্চিও।

প্রকৃতির সৌন্দর্য আমাদের এমনভাবে অভিভূত করে রাখলে যে অনেকখানি পথ পার হয়েও আমরা কেউ কারুর সঙ্গে বাক্যবিনিময় করবার অবসর পেলুম না। আমাদের হয়ে তখন কথাবার্তা কইতে লাগল উচ্ছসিত

সুগন্ধ বাতাস, মর্মরিত তরুলতা, কলরবমুখরা নদী ও নাম-না-জানা সব গানের পাখি। এই শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময়ী মোহিনী রাত্রি খানিকক্ষণের জন্যে ভুলিয়ে দিলে সেই বিভীষণ রাজা রুদ্রপ্রতাপের স্মৃতিও।

সর্বপ্রথমে কথা কইলেন অবিনাশবাবু বললেন, বিনয়বাবু, একটা বিষয় আমি অনুমান করতে পারছি।

—কী?

—রুদ্রপ্রতাপ বিশালগড়ে ফিরবে কেমন করে। আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন?

খানিক দূরে একটা পাহাড়ের বুকে নির্ঝর ঝরে পড়ছিল তরল রৌপ্যধারার মতো। সেইদিকে তাকিয়ে আমি বললুম, আমি এখন কোনও কথাই অনুমান করবার চেষ্টা করছি না অবিনাশবাবু। আমি বাস করছি এখন অন্য জগতে।

—মানে?

—রাজা রুদ্রপ্রতাপ নয়, আমার ঘাড়ে চেপেছে এখন কোনও কবির প্রেতাত্মা।

—কী রকম?

—কবিরা যা নিয়ে কারবার করেন, আমি হয়েছি তারই কারবারি।

—অর্থাৎ?

—আমার উপরে দেখছি চাঁদকে, নীলিমার গায়ে দেখছি জ্যোৎস্নাকে, পাহাড়ের উপরে দেখছি নির্ঝরিণী আর বনে বনে দেখছি কত রূপ, কত রস, কত ছন্দ! ভুলে গিয়েছি অবিনাশবাবু, আপনার ওই রুদ্রপ্রতাপকে একেবারে ভুলে গিয়েছি।

অবিনাশবাবু গভীর স্বরে বললেন, কিন্তু রুদ্রপ্রতাপ যে আমাদের ভোলেনি, সেটাও আপনি ভুলে গিয়েছেন নাকি?

তৎক্ষণাৎ সজাগ হয়ে বললুম, এবারে আমার স্বর্গ থেকে হল পতন। এমন সুন্দর জগতে সেই মূর্তিমান অন্ধকারের কথা কেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন?

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, স্মরণ না করিয়ে দিয়ে উপায় নেই। আমাদের হাতে সময় খুব অল্পই যে-কোনও মুহূর্তে রুদ্রপ্রতাপকে আবার আমরা চোখের সামনে দেখতে পারি।

—বুঝতে পারছি। কিন্তু আপনি আমাকে কী অনুমান করতে বলছিলো।

—রুদ্রপ্রতাপ কেমন করে বিশালগড়ে ফিরে আসছে, সেকথা বলতে পারেন?

আপনি আমার সঙ্গে আছেন বলে ও-সব বিষয় নিয়ে আমি মস্তক ঘর্মাক্ত করবার চেষ্টা করিনি। আপনি কিছু অনুমান করেছেন?

অবিনাশবাবু বললেন, রুদ্রপ্রতাপ বিশালগড়ে আসবে সেই সিন্দুকেরই ভিতরে, যা বহন করে আনছে একদল বেদে।

—তাই নাকি?

—সেইরকম তো সন্দেহ হয়। সূর্যোদয়ের পূর্ব-মূহুর্তে কোনও এক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে রুদ্রপ্রতাপ আশ্রয় নিয়েছে সেই সিন্দুকের ভিতরে। দিনের বেলায় যে হয় মৃত্যুবৎ, নিশ্চয়ই সে বাইরের পৃথিবীর চোখের সামনে থাকবে না।

আমি বললুম, কিন্তু এখন আবার রাত্রি হয়েছে। রাজা যে এখনও সজীব হয়ে ওঠেনি, একথা কি জোর করে বলা যায়?

—তা যায় না। কিন্তু সে-ক্ষেত্রে এর মধ্যেই নিশ্চয় আবার আমরা রাজার দেখা পেতুম। আমার মনে হয়, যে-কারণেই হোক রাজা এখনও তার নিরাপদ বাসা ছেড়ে বাইরে বেরুতে সাহস করেনি।

আচম্বিতে খুব কাছে বনের ভিতর থেকে হা হা হা হা করে জেগে উঠল আবার সেই অতিপরিচিত ও ভয়াবহ অট্টহাসির পর অট্টহাসির উচ্ছ্বসি।

আমার চোখের সুমুখে এক মুহূর্তে যেন দপ করে নিবে গেল আকাশ ও পৃথিবী-ভরা পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার ঔজ্জ্বল্য।

এক লাফে পিছিয়ে এসে ও প্রায়-আবদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলুম, 'অবিনাশবাবু, অবিনাশবাবু!' ব্যাপারটার আকস্মিকতা এতই অভাবিত যে অবিনাশবাবু পর্যন্ত খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলেন। ও স্বর যে কার তা বুঝতে কিছুই বিলম্ব হয় না। পৃথিবীতে একমাত্র লোকেরই কণ্ঠ থেকে ওরকম পৈশাচিক হাস্যধ্বনি জাগ্রত হতে পারে।

আমরা পরস্পরের হাত ধরে খানিকক্ষণ নীরব হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিন্তু অট্টহাসি আর শোনা গেল না। অট্টহাসি থেমে গেলেও তার প্রতিধ্বনি তখনও শোনা যেতে লাগল দূরে দূরে পাহাড়ের শিখরে শিখরে এবং উপত্যকায় উপত্যকায়। আলোর উপরে নেমে এল যে অদৃশ্য অন্ধকারের ঘেরাটোপ, তা চোখে দেখা না গেলেও যেন হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। কম্পিত স্বরে বললুম, অবিনাশবাবু, আপনার ধারণা সত্য নয়। রাজার দেহ আবার জ্যান্ত হয়ে উঠেছে।

অবিনাশবাবু বললেন, হ্যাঁ। কেবল জ্যান্ত হয়নি, বোধহয় সে আমাদের অনুসরণও করছে।

ত্রস্ত চোখে পিছন দিকে তাকিয়ে বললুম, কিন্তু তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

অবিনাশবাবু বললেন, তাকে দেখতে পাচ্ছেন না কারণ সে দেখা দিতে সাহস করছে না।

—সাহস করছে না?

—না। আপনার কবচোর কথা আবার ভুলে যাচ্ছেন নাকি?

—এমন অবস্থায় ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়! কিন্তু রাজা যদি সত্য-সত্যই ভয় করে, তবে অকারণে এমনভাবে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ দিলে কেন?

—সেইটেই আমি বুঝতে পারছি না। তার পক্ষে আত্মগোপন করে থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু তা যখন সে করেনি তখন তার মনের ভিতরে নিশ্চয়ই কোনও গোপন অভিসন্ধি আছে। তার শয়তানি বুদ্ধি এখন কোন পথ ধরবে তাও বোঝা যাচ্ছে না। আত্মরক্ষার জন্যে এখন আমাদের আরও সাবধান হতে হবে।

—এই বনে কী করে আমরা আরও সাবধান হব?

—অপেক্ষা করুন, এখনই দেখতে পাবেন।

আমরা তখন যেখানে এসে দাঁড়িয়েছিলুম তার একদিকে পাহাড় আর বন এবং আর একদিকে জঙ্গল শেষ হয়ে গিয়ে আরম্ভ হয়েছে সুদূর-বিস্তৃত একটা প্রান্তর। অনেক দূরে প্রান্তরের মাঝখানে একটা সুদীর্ঘ রৌপ্যরেখা থেকে-থেকে চকচক করে উঠছিল—বোধহয় কোনও নদী।

আমাকে নিয়ে অবিনাশবাবু পথ ছেড়ে নেমে প্রান্তরের উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বিড়বিড় করে কি এক দুর্বোধ মন্ত্র বলতে বলতে মাটির উপরে মণ্ডলাকারে টেনে দিতে লাগলেন একটা রেখা।

সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, ও কী করছেন অবিনাশবাবু?

অবিনাশবাবু নিজের কার্য শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মন্ত্রঃপূত গণ্ডী টেনে দিলুম।

—কেন ?

—রুদ্রপ্রতাপ যখন আবার জেগেছে, তখন এই গণ্ডীর ভিতরে বসেই আজকের রাতটা আমাদের পুইয়ে দিতে হবে। সাবধান, এই গভীর ভিতর থেকে কিছুতেই বাইরে যাবার চেষ্টা করবেন না। এর বাইরে গেলেই বিপদ। কিন্তু ভিতরে থাকলে ভূত, প্রেত, দৈত্য, দানব—কেউই আমাদের কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। রুদ্রপ্রতাপের সমস্ত শয়তানি বুদ্ধিই এই গণ্ডীর বাইরে একেবারে মাঠে মারা যাবে। আসুন বিনয়বাবু, মাঝখানে এসে বসুন। মন থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করুন। ইচ্ছা করেন তো রীতিমতো নাক ডাকিয়ে রাত কাবার করলেও কোনও ক্ষতি হবে না।

আমি বললুম, আমার নাক আজ রাতে ডাকবার চেষ্টা করবে? আপনি কি পাগল হয়েছেন?

—তবে আপনার নীরব নাসিকা দিয়ে লক্ষ্মীছেলেটির মতো এইখানে বসে আবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করুন।

—তাও অসম্ভব। আমার ঘাড় থেকে কবির প্রেতাত্মা এখন নেমে গিয়েছে। রুদ্রপ্রতাপের সাঙ্ঘাতিক মূর্তি ছাড়া আমি আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

—উত্তম। গভীর ভিতরে বসে তাও দেখলে ক্ষতি নেই; কিন্তু খুব হাঁশিয়ার, গণ্ডীর বাইরে একবারও পা বাড়াবেন না।

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম, মুখে কিছু বললুম না। অবিনাশবাবুএকটা মস্ত হাই তুলে বললেন, ঘুম আমাকে হাতছানি দিচ্ছে,

আমি জেগে থাকতে পারব না। গভীর ভিতরে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। প্রেতলোকের পল্টন এলেও এ বৃহ ভেদ করতে পারবে না। তাই আবার বলি বিনয়বাবু, আমার সঙ্গে আপনিও করুন নিদ্রাদেবীকে সাধনা।

—ক্ষমা করবেন অবিনাশবাবু, আমার চোখ থেকে সব ঘুম ছুটে গিয়েছে।

অবিনাশবাবু নাচারভাবে দূর্বাকোমল মাটির উপরে দেহকে লম্বমান করে কিঞ্চিৎ কঠিন স্বরে বললেন, কিন্তু ঘুমোবার আগে একটা কথা বলে রাখি বিনয়বাবু। সর্বদাই মনে রাখবেন, দুষ্ট আত্মা-অর্থাৎ পিশাচ করেছে আপনার দেহকে স্পর্শ। রাজা কে, আপনি তা জানেন। যতই রক্ষাকবচ, ধারণ করুন, আপনাকে সে সহজেই ভোলাতে পারবে। পিশাচের ছলনা কোন দিক থেকে যে আপনাকে আকর্ষণ করবে, আপনি জেনেও তা বুঝতে পারবেন না বলেই মনে করি। কিন্তু সর্বক্ষণই স্মরণ রাখবেন, আপনার পক্ষে গণ্ডীর ভিতরটা সম্পূর্ণ নিরাপদ, আর গভীর বাহিরটা হচ্ছে একান্ত বিপজ্জনক।' তিনি পাশ ফিরে শুলেন। মিনিটকয়েক যেতে না-যেতেই তার নাসিকার মধ্যে জাগ্রত হল দস্তুরমতো হুঙ্কারধ্বনি। সেই কোলাহল শ্রবণ করে দুটো শৃগাল চরম বিস্ময়ে উৎকর্ণ হয়ে একটা ঝোপের ভিতর হতে একবারমাত্র মুখ বাড়িয়ে মুহূর্তেই সে স্থান ত্যাগ করতে বিলম্ব করলে না।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম মাঠের উপরে দূরের চাকচিক্যময় রুপোলি নদী-রেখার দিকে। ধীরে ধীরে আবার মনের ভিতরে হতে লাগল অসাময়িক কবিত্বের সঞ্চার। সে কবিত্বকে অসাময়িক ছাড়া আর কী বলব? যেখানে একটু আগেই শোনা গেছে অলৌকিক এবং পৈশাচিক অট্টহাস্য, সেখানে কোনও সত্যিকার মহাকবির মনও ধারণায় আনতে পারত না পেলাব কবিত্বকে। কতক্ষণ এইভাবে কেটে গেল আমি তা জানি না, কিন্তু

হঠাৎ আমার সন্দেহ হতে লাগল, সমুজ্জ্বল নদী-রেখার ঠিক উপরেই ক্রমে-ক্রমে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে দুগ্ধধবল চন্দ্রকারধারার কতক কতক অংশ।

ভুল দেখছি ভেবে আমি একবার দুই হাতে দুই চোখ কচলে আরও ভালো করে দেখলুম, সেই পুঞ্জীভূত জ্যোৎস্না যেন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এগিয়ে আরও এগিয়ে আরও এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে ধীরে আমারই দিকে। জ্যোৎস্নার এমন কল্পনাতীত ব্যবহার এর আগে আর কখনও আমি লক্ষ করিনি। এও কি সম্ভব?

আসছে, আসছে, আসছে—কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত পুঞ্জীকৃত জ্যোৎস্না।

ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলুম না। আবার বোধশক্তি যেন ক্রমেই কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল। কেবল এইটুকুই অনুভব করলুম, আমার মনের মধ্যে যেন নূপুর বাজাচ্ছে কী এক অজানিত আনন্দের ছন্দ। যেন এই আনন্দকে লাভ করতে পারলে আমি অনায়াসেই পরিত্যাগ করতে পারি যে-কোনও সাম্রাজ্যের সিংহাসন!

আরও কাছে-আরও, আরও আরও কাছে একে একে একে এগিয়ে এল সেই আশ্চর্য চন্দ্রকিরণপুঞ্জ। যা ছিল প্রথমে ছায়া-ছায়া স্বচ্ছ, দেখতে দেখতে তা গ্রহণ করতে লাগল এক-একটা নির্দিষ্ট আকর।

ঘনীভূত হয়ে উঠছে, আকারগুলো ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে উঠছে। পরে পরে, অবশেষে পাশে পাশে আত্মপ্রকাশ করলে তিন-তিনটে মূর্তি। মূর্তিগুলো যেন পরিচিত, এর আগে যেন দেখেছি তাদের কোনও স্বপ্নজড়িমায়। কিন্তু সে কোথায়, সে কোথায়?...

কোথায়? তা ধারণাতেও আনতে পারলুম না। আমি তখন একেবারেই আত্মবিস্মৃতি। আমার কাছ থেকে তখন বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে যেন পৃথিবীর অস্তিত্ব।

পাশাপাশি তিনটি তরুণীর সঞ্চারিণী লতার মতন তনু। এমন সব পরমা সুন্দরী আমার চক্ষু জীবনে আর কখনও দেখেনি। রূপকথার রাজকন্যারাও তুচ্ছ তাদের কাছে। বকপক্ষ শুভ্র তাদের দেহ এবং তাদের একজনের চক্ষে জ্বলছে গোলাপি আলো, আর-একজনের চক্ষে বেগুনি আলো এবং আর-একজনের চক্ষে নীল আলো। চোখে যে এতরকম রঙের আলো জ্বলতে পারে, একথা জানতুম না কোনওদিনই।

তিনটি তরুণী এগিয়ে এসে দাঁড়াল পাশে পাশে পাশে। যার চোখে জ্বলছিল। গোলাপি আলো, সে বীণানিন্দিত স্বরে বললে, বন্ধু, আমায় কি চিনতে পারছ না?

আমি তাকে চিনলুম, কিন্তু মুখ আমার হয়ে গেছে বোবা! যার চোখে জ্বলছিল বেগুনি আলো, সে এগিয়ে এসে নির্ঝরিণীর ছন্দভরা কণ্ঠে বললে, এসো বন্ধু, এখানে এসো-আকাশের চাদ চায় পৃথিবীর ছেলেমেয়েদের খেলা দেখতে!

সে বললে, বন্ধু, ও বন্ধু! আজি তুমি আমায় চিনতে পারছ না? সেদিন তোমায় দেখেছিলুম কী চমৎকার! কিন্তু আজ দেখছি তোমার গলায় ঝুলছে তামার তৈরি কী একটা বিশ্রী জিনিস! ওটা দিয়ে যাও আমার হাতে-আমি ছুড়ে ফেলে দি ওটাকে নদীর জলে! অমন সুন্দর দেহে অমন কুৎসিত জিনিস কি মানায়? দাও দাও, ওটা আমায় দাও, আর ওর ভার বহন কোরো না!' বলতে বলতে সে সামনে বাড়িয়ে দিলে দুইখানি ফুলের পাপড়ির মতন নরম হাত।

আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম মাতালের মতন টলতে টলতে—সমস্ত পৃথিবী যেন আমার ধারণার বাইরে। নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি গলা থেকে কবচখানা টেনে বার করলুম, তারপর অবিনাশবাবুর টানা রেখা-মণ্ডলের বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ালুম—

কিন্তু পর-মুহূর্তেই প্রচণ্ড এক হাতের টানে আছাড় খেয়ে মাটির উপরে পড়লুম পিছন দিকে। ক্রোধে বিচলিত কণ্ঠে অবিনাশবাবু চিৎকার করে বললেন, ভাগ্যিস আমি হঠাৎ জেগে উঠেছি, নইলে আপনার কী হত বলুন দেখি? আপনি গন্ডীর বাইরে গিয়ে কবচ দিতে যাচ্ছিলেন কার হাতে? আপনি মূর্খ, আপনাকে গলাগলি দেবার ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না! চুপ করে বসে থাকুন এইখানে!

এবারে আর অট্টহাসি নয়—আচম্বিতে কোথা থেকে কার কণ্ঠে জেগে উঠল এমন আর্তস্বর, নরকেও যা কেউ কোনওদিন শ্রবণ করেনি।

সঙ্গে সঙ্গে সেই তিনটে অপূর্ব-সুন্দর—কিন্তু অপার্থিব নারীমূর্তি সরে সরে—ক্রমে দূরে, আরও দূরে সরে গেল। দেখতে দেখতে তাদের দেহ মিলিয়ে যেতে লাগল যেন কোনও বায়বীয় পদার্থের মতো বাতাসের সঙ্গে। কোথায় গোলাপি আলো, কোথায় বেগুনি আলো, কোথায় নীল আলো! কেমন একটা অদ্ভূত ক্রন্দন প্রথমে অস্পষ্ট আর অস্পষ্ট হয়ে শোনাতে লাগল বহু— বহু দূরের প্রতিধ্বনির মতো। তারপর তাও মিলিয়ে গেল—জাগ্রত হয়ে রইল কেবল স্বাভাবিক এবং পরিপূর্ণ চাঁদের আলো।

অবিনাশবাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, বিনয়বাবু! যা বারণ করেছিলুম, আপনি তাই করতে যাচ্ছিলেন!

আমি হাতজোড় করে বললুম, সব এখন বুঝতে পেরেছি! আমি যাচ্ছিলুম নরকে! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন!

অবিনাশবাবু বললেন, এখানে ক্ষমার কথা হচ্ছে না বিনয়বাবু। এখানে আছে কেবল যুক্তির কথা-যাক, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। বিগতকে নিয়ে আমি নাড়াচাড়া করতে চাই না। চেয়ে দেখুন, পূর্ব-চক্রবালে দেখা যাচ্ছে গোলাপি উষার মোহনীয় দৃষ্টি। এইবারে শেষ হবে যত ভৌতিক চক্রান্ত।

একটু একটু করে। ধবধবে নরম আলোর আভায় ভরে গেল সমস্ত আকাশ। দূরে, কাছে— গাছে গাছে গেয়ে উঠল জাগ্রত প্রভাতে গীতকারী বিহঙ্গের দল।

উঠে দাঁড়িয়ে পূর্ণকণ্ঠে বললুম, জয়, প্রভাত-সূর্যের জয়! চলুন অবিনাশবাবু, আর কোনওদিন আমি পদচ্যুত হব না!

আমরা হত্যাকারী

আবার ধরেছি বিশালগড়ের পথ।

চিকন রোদে চারিদিক করছে ঝলমল, কোথাও নেই এতটুকু কালিমার আভাস। গাছপালার ছায়া পর্যন্ত যেন মাজাঘাষা, সমুজ্জ্বল। সারা পথ ধরেই কানে জাগছে পাখিদের আনন্দগীতি, ঝরনার সুরও শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বিশালগড়ের অরণ্য থেকে এখন বিলুপ্ত হয়েছে সমস্ত বিভীষিকার ভাব।

আমার মনও নির্ভয়। এখন দিনের বেলা, শয়তানের রাজা অসহায় মড়ার মতন পড়ে আছে কোথায়, সে আর আমাদের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।

অবিনাশবাবু বললেন, বিনয়বাবু, আমাদের আরও তাড়াতাড়ি পা চালাতে হবে।

—কেন অবিনাশবাবু, তাড়াতাড়ির দরকার কী?

—দিনের আলো থাকতে থাকতে আমরা যদি বিশালগড়ে পৌঁছতে না পারি, তাহলে আমাদের চরম বিপদের সম্ভাবনা। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পিশাচ হবে জীবন্ত; সঙ্গে সঙ্গে আবার জগবে রক্তভক্ত নেকড়ের দল, আর সেই ভীষণ-সুন্দর নারীমূর্তিগুলো। তখন কোন দিক দিয়ে কেমন করে যে আসবে বিপদ-আপদ, আমরা তা ধারণাতেও আনতে পারব না।

অবিনাশবাবুর সাবধান-বাণী শুনে পায়ের গতি করলুম দ্রুততর। বিশালগড়ে যখন পৌঁছলুম, বেলা তখন পাঁচটা।

দিনের বেলায় সেই প্রকাণ্ড অট্টালিকাখানাকেও যেন দেখাচ্ছে মৃত্যুবৎ। বিস্তৃত অঙ্গনের উপরে জগতে লাগল কেবল আমাদের পায়ের জুতোর শব্দ, তা ছাড়া কোনওদিক থেকে কোনও শব্দই শুনতে পেলুম না। এখানে হয়েছে যেন নিখিল জীবনের সমাধি। এখানে যেন কণ্ঠস্বরকে মুক্ত করতেও হয় আতঙ্ক ।

সেই প্রকাণ্ড দরজা। পাল্লা দুখানা ছিল বন্ধ, হাত দিয়ে ঠেলতেই যেন কর্কশ স্বরে প্রতিবাদ করতে করতে খুলে গেল।

ভিতরে ঢুকে সোজা গিয়ে হাজির হলুম। সেই ঘরে, যেখানে কিছুদিন আগে বাস করেছিলুম বন্দির মতো।

ঘরের সাজসজ্জার কিছুই পরিবর্তন হয়নি, নূতনত্বের মধ্যে দেখলুম খালি, সর্বত্রই পড়েছে ধুলোর একটা আবরণ।

জিজ্ঞাসা করলুম, এখন আমরা কী করব অবিনাশবাবু?

অবিনাশবাবু বললেন, প্রথমেই আমাদের যেতে হবে রাজার শয়নগৃহে।

—কিন্তু আগেই তো আপনাকে বলেছি, দিনের বেলায় রাজা তার ঘরের ভিতর থাকে না।

অবিনাশবাবু যেন অধীরভাবেই বললেন, জানি বিনয়বাবু, ও-কথা আর আমাকে মনে করিয়ে দিতে হবে না। আমি যেতে চাই একতালার সেই অন্ধকার স্যাতসেঁতে ঘরে, যেখানে আপনি সিন্দুকের ভিতরে রাজাকে শুয়ে থাকতে দেখেছেন।

—তাহলে আমার সঙ্গে এদিকে আসুন।

তারপর ঠিক যেভাবে প্রথমে রাজার ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলুম, কার্নিশের উপর দিয়ে ঠিক সেইরকম করেই আবার ঢুকলুম সেই ঘরের ভিতরে। সে ঘরের কোনও পরিবর্তন হয়নি। সেকেলে টেবিলের উপরে ধুলো-মাখানো স্বর্ণমুদ্রগুলো পর্যন্ত ঠিক সেইভাবেই পড়ে রয়েছে।

দেওয়ালের দরজাটা ঠেলে পেলুম আবার সেই সরু পথ ও সঙ্কীর্ণ সিঁড়ির সার।

আবার নামতে লাগলুম নীচের দিকে। সেবারের মতো এবারও মনের মধ্যে জেগে উঠল একটা রোমাঞ্চকর অপার্থিব ভাব। ইহলোক থেকে যেন এগিয়ে যাচ্ছি পরলোকের দিকে। জানি পিশাচ রাজা এখন উপদ্রব করবার শক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, তবু এই অপার্থিব ভাবটা মনের ভিতর থেকে তাড়াতে পারলুম না। অবিনাশবাবু কী ভাবছিলেন জানি না, কিন্তু তিনি একেবারেই চুপচাপ।

তারপর সেই ঘর। কিন্তু আজ আর সেখানে গলিত শবদেহের দুর্গন্ধও নেই, আর সেই প্রকাণ্ড সিন্দূকটাও সেখান থেকে অদৃশ্য।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে অবিনাশবাবুধীরে ধীরে বললেন, আমাদের ভয়ে রুদ্রপ্রতাপ কি তার শোবার ঘর বদলেছে?

—হতেও পারে, অসম্ভব নয়।

—তাহলে আজ দেখছি বাড়ির সর্বত্রই তন্ন-তন্ন করে খুঁজতে হবে। কিন্তু সূর্যাস্তের আগে সেটা সম্ভব হবে কি? যাক, পরের কথা পরেই ভাবা যাবে, এখন আসুন, আমাদের অন্বেষণ আরম্ভ হবে একেবারে বাড়ির উপরতালা থেকে।

উঠে গেলুম তিনতলার সেই সুদীর্ঘ দালানে। সেখানে সেই ঘরের পরে ঘর, আর প্রত্যেক ঘরের দরজাতেই একটা করে তালা লাগানো। কিন্তু সেদিনকার মতো আজকেও দেখলুম। সেই বড়ো হলঘরটির দরজায় কুলুপ লাগানো নেই, হাত দিয়ে ঠেলতেই ধীরে ধীরে পাল্লা দু-খানা খুলে গেল। কিন্তু ঘরের ভিতরে ঢুকতে গিয়েই বুকের ভিতরে লাগল একটা মহা-আতঙ্কের ধাক্কা । তাড়াতাড়ি আবার পিছিয়ে এলুম।

অবিনাশবাবুও এগিয়ে দেখলেন, তারপরে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন স্থির মূর্তির মতো। ঘরের মাঝখানে রয়েছে একখানা মস্ত বড়ো খাট এবং তার উপরে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে সেই ভীষণ সুন্দর ও অপার্থিব তিন নারীমূর্তি।

খানিকক্ষণ পরে অবিনাশবাবু মুখ ফিরিয়ে আমাকে বললেন, 'আসুন!' অবিনাশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আড়ষ্টভাবে এবং রীতিমতো ভয়ে-ভয়েই আমিও ঘরের ভিতর ঢুকে সেই ভয়াবহ খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সত্য, এদের দেখবার আগে এমন সৌন্দর্যের কল্পনাও করা যায় না। তাদের তিনজনের পরনে তিনখানি গোলাপি, বেগুনি আর নীল রঙের

পাতলা ফিনফিনে শাড়ি। তা ছাড়া দেহের অন্য কোথাও কোনওরকম অলঙ্কারই নেই। এই নিরলঙ্কার দেহের জন্যেই যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে তাদের আকৃতি। মাথার চিকন কালো চুলের রাশি এলিয়ে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। মোমের মতো নরম দেহের উপর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে যেন ভিতরকার রক্তের আভা। কী নিটোল বাহু, কী টানা টানা ভুরু, কী চমৎকার ডাগর ডাগর চোখ! ঠোঁটগুলি যেন ঠিক মিহিন ফুলের পাপড়ি এবং আধ-খোলা ঠোঁটের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে ধবধবে দাঁতগুলি মুক্তাসারির মতো। পাশাপাশি শুয়ে আছে যেন বড়ো শিল্পীর হাতে গড়া তিনটি চমৎকার পুতুল।

কিন্তু এই সুন্দর আকৃতির পিছনে আছে যে ভয়ঙ্কর প্রকৃতি, এখন তাদের দেখে কিছুতেই তা আন্দাজ করা সম্ভবপর নয়। তাদের চোখের পাতা খোলা থাকলেও তাদের ভিতর থেকে বেরুচ্ছে না কোনও জাগ্রত দৃষ্টির আভাস। শ্বাস-প্রশ্বাসে বুকের উত্থান-পতন নেই বটে, কিন্তু তাদের দেখলে মৃত বলেও সন্দেহ হয় না। এরা আশ্চর্য জ্যান্ত মড়া!

—'এদিকে সরে আসুন!' এমন গভীর ও কঠোর স্বরে অবিনাশবাবু এই কথাগুলো বললেন, যে আমি সচকিত দৃষ্টি তুলে তাঁর দিকে ফিরে তাকালুম। তাঁর মুখের উপরে একটা নৃশংস দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব।

সরে এসে জিজ্ঞাসা করলুম, অবিনাশবাবু, এখন আপনি কী করবেন?

অবিনাশবাবু উত্তর দিলেন না, হাতব্যাগ খুলে ভিতর থেকে টেনে বার করলেন একখানা ধারালো চকচকে ভোজালি।

আমি বিপুল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলুম, একী অবিনাশবাবু? আপনি ভোজলি বার করলেন কেন?

দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুট স্বরে তিনি ঘললেন, মড়া যাতে আর না বাঁচতে পারে, সেই ব্যবস্থাই আমি করব!

আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল। শিউরে উঠে বললুম, তার মানে? আপনি কি এদের হত্যা করতে চান?

অবিনাশবাবু পাগলের মতো হা হা করে হেসে উঠে বললেন, মড়াকে আবার কেউ হত্যা করতে পারে নাকি?

—কিন্তু আপনি তো জানেন এরা কেউ মড়া নয়? এরা ঘুমিয়ে পড়ে আবার জেগে ওঠে ?

—হাঁ, আবার জেগে ওঠে, জীবন্ত মানুষের রক্তপান করবার জন্যে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন না, ওদের ঠোঁট অত বেশি রাঙা কেন? ওদের ঠোঁটে এখনও মাখানো রয়েছে মানুষের শুকনো রক্তের দাগ। আর খানিক পরেই ওরা আবার জেগে উঠবে, আর রাক্ষসীর মতো আক্রমণ করবে আমাদেরই। কিন্তু ওদের জাগার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে, আমি আর ওদের জগতে দেব না—না, না, কখনওই না!'-বলতে বলতেই তিনি ভোজলিখানা তুলে ধরলেন মাথার উপরে।

আমি বলে উঠলুম, করেন কী, করেন কী অবিনাশবাবু!

বিষম রাগে চেঁচিয়ে উঠে অবিনাশবাবু বললেন, “আপনি নির্বোধ! প্রেতিনীর উপরে দয়া?’ ভোজালিখানা তুলে অবিনাশবাবু আবার ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। সে দৃশ্য সহ্য করতে পারব না বলে আমি বেগে ঘরের ভিতর থেকে পালিয়ে এলুম। তারপরেই দালানে দাঁড়িয়ে আচ্ছন্নের

মতো শুনলুম আঘাতের পর আঘাতের শব্দ, এবং তিনটি বিভিন্ন কণ্ঠে তিন-তিনবার কান-ফাটানো তীব্র চিৎকার।

অবিনাশবাবু দ্রুতপদে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখচোখ উদভ্রান্তের মতো এবং তার জামাকাপড়ে টকটকে লাল টাটকা রক্তের দাগ। তাঁর হাতের ভোজলি থেকেও ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে। প্রায় অস্ফুট স্বরে তিনি বললেন, 'চলে আসুন বিনয়বাবু, শিগগির এখান থেকে চলে আসুন! পৃথিবী থেকে তিনটে মহাপাপ চিরদিনের জন্যে বিদায় হয়েছে-ওদের মুণ্ড আর জোড়া লাগবে না।'

নেকড়ে এবং রুদ্রপ্রতাপ

অবিনাশবাবুর সঙ্গে আমি আবার বিশালগড়ের বাইরে এসে দাঁড়ালুম।

বিশালগড়ের ভিত্তির তলায় আছে বোধহয় কোনও ছোটো পাহাড়। কারণ এখানটা চারিদিকের অন্য সব জায়গার চেয়ে অনেক উঁচু। এখানে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় অনেক দূর পর্যন্ত।

পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝলুম, আর খানিকক্ষণ পরেই হবে সূর্যাস্ত। মনে হতেই বুকটা ছাৎ করে উঠল। সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ততক্ষণ পর্যন্ত পিশাচের নিদ্রাভঙ্গ হবে না। কিন্তু তারপর?

বোধহয় সেই কথাই ভাবছিলেন অবিনাশবাবুও। কারণ তিনি বললেন, বিনয়বাবু, বিশালগড়ের ভিতরে তো রুদ্রপ্রতাপের কোনওই পাত্তা পেলুম না। খুব সম্ভব এই অরণ্যেই কোনও গুপ্ত স্থানে সে দিবানিদ্রায় অসাড়

হয়ে পড়ে আছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই হবে। আবার তার জাগরণ, আর আমাদের পক্ষে সেটা হবে অত্যন্ত বিপদের কথা।

আমি বললুম, রাতের বেলায় এই বিশাল অরণ্যের কোথাও আমরা নিরাপদ নই। পিশাচ তার অপার্থিব শক্তি নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের খুঁজে বার করবে। সূর্যাস্তের আগে আমরা কিছুতেই এই বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে পারব না। তখন আমাদের কী উপায় হবে অবিনাশবাবু?

—আত্মরক্ষা করার জন্যে আমাদের একমাত্র উপায় হচ্ছে কালকের মতো আবার মন্ত্রঃপূত গণ্ডীর মধ্যে রাত্রিযাপন করা।

—মানলুম, আপনার মন্ত্রঃপূত গভীর ভিতরে কোনও প্রেত কি পিশাচ আসতে পারবে না। কিন্তু আর একটা পার্থিব বিপদের কথা। আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন?

—আপনি কী বিপদের কথা বলছেন?

—আপনাকে কি সেই নেকড়ের দলের কথা আমি বলিনি? সেই দারুণ নেকড়ের দল রুদ্রপ্রতাপের বশীভুত। সে যদি নেকড়ের দলকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়, তাহলে ওই মন্ত্রঃপূত গণ্ডী কি আমাদের রক্ষা করতে পারবে?

অবিনাশবাবু খানিকক্ষণ গভীর মুখে স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে শুষ্ক কণ্ঠে বললেন, নেকড়ের দলের কথা সত্যিই আমার মনে ছিল না। গণ্ডী তো তাদের বাধা দিতে পারবে না! তবে, আমাদের পক্ষে একমাত্র সান্ত্বনা যে, আমরা নিরস্ত্র নই। আমাদের দুইজনেরই সঙ্গে আছে রিভলভার; অন্তত যতক্ষণ বঁচিব, ততক্ষণ তাদের বাধা দিতে পারব!

হ্যাঁ যতক্ষণ বাঁচব, ততক্ষণ। কিন্তু তারপর?

তাঁর পরের কথা এখন আর ভেবে কোনওই লাভ নেই। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলুম, তা সম্পূর্ণরূপে সফল হল না। পিশাচীদের বধ করেছি বটে, কিন্তু পালের গোদা সেই পিশাচ এখনও বর্তমান। সে যে কী করবে আর না করবে, তাও আমরা অনুমান করতে পারছি না। আমাদের সম্বল কেবল ভগবানের দয়া। তারই উপরে নির্ভর করা ছাড়া অন্য কোনওই উপায় নেই।

আবার আকাশের নিকে তাকিয়ে দেখলুম।

অস্ত যাবার আগে সূর্যের মুখ যতই রাঙা হয়ে উঠছে, তার কিরণ হয়ে আসছে ততই পরিম্লান। দিনের আলো থাকতে থাকতে বাসায় ফেরবার জন্যে এখনই পাখিদের মধ্যে জেগেছে ব্যস্ততা। শূন্য পথ দিয়ে দলে দলে উড়ে যাচ্ছে বুনো হাঁস, বক, কাক, শালিক ও চিল প্রভৃতি বিহঙ্গের দল। কখনও হাঁস ও বিকের ঝটপট শব্দে এবং কখনও বা টিয়া ও শালিকের কলরবে: থেকে-থেকে ভেঙে যাচ্ছে অরণ্যের নিস্তব্ধতা। হঠাৎ বাতাসও কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগল যেন আসন্ন রাত্রির ভয়ে অরণ্যের মর্মর-কাতরতা। তার পরেই অনেক, অনেক দূর থেকে শুনতে পেলুম একটা ভয়াবহ অস্পষ্ট ধ্বনি।

সচকিত কণ্ঠে বললুম, অবিনাশবাবু, শুনছেন?

—কী?

—আপনি একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছেন?

—হ্যাঁ, পাচ্ছি। ও কীসের শব্দ?

—নেকড়েরা আসছে।

—নেকড়েরা?

—হ্যাঁ। নেকড়েরা আসছে, আর ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছে। যে শব্দ শুনছেন, ও হচ্ছে নেকড়েদের গর্জন। ওই ভয়ানক শব্দ আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত। পিশাচ রুদ্রপ্রতাপের সঙ্গে নেকড়েদের কী অলৌকিক যোগাযোগ আছে আমি তা জানি না। কিন্তু এরই মধ্যে কোনও অদ্ভুত উপায়ে তাদের কাছে গিয়ে পৌঁছেছে রুদ্রপ্রতাপের আদেশ। হয়তো সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই নেকড়েরা আমাদের কাছে এসে পড়বে। অবিনাশবাবু, মাত্র দুটো রিভলভারের গুলিতে আমরা কি শতাধিক নেকড়েকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব?

অবিনাশবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগলেন। আমি উৎকীর্ণ হয়ে শুনতে লাগলুম, নেকড়েদের চিৎকার ক্রমেই স্পষ্ট, আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সূর্যাস্তের আর কত দেরি? বোধহয় মিনিট পনেরোর বেশি নয়। নেকড়েদের এখানে আসতে আর কত দেরি? হয়তো মিনিট পনেরোরও কম।

হঠাৎ অবিনাশবাবু বলে উঠলেন, ভয় নেই বিনয়বাবু, ভয় নেই। আত্মরক্ষার একটা উপায় আমি আবিষ্কার করেছি।

সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলুম, কী উপায়, অবিনাশবাবু?

—ওই যে খুব উঁচু বড়ো গাছটা দেখছেন, ওরই উপরে উঠে আজ আমরা রাত্রিযাপন করব।

—ওই গাছের উপরে আমরা নেকড়েদের ফাঁকি দিতে পারব বটে, কিন্তু আপনি রুদ্রপ্রতাপের কথা ভুলে যাচ্ছেন কেন ? গাছে উঠলে তাকেও কি ফাঁকি দিতে পারব?

—রুদ্রপ্রতাপের কথা আমি ভুলিনি বিনয়বাবু। ওই গাছের চারিদিক ঘিরে আমি কেটে দেব মন্ত্রপড়া গণ্ডী। রুদ্রপ্রতাপ যদি গণ্ডীর ভিতরে ঢুকতে না পায়, তাহলে সে গাছের উপরে গিয়ে উঠবে কেমন করে?

আমি শুকনো হাসি হেসে বললুম, রুদ্রপ্রতাপ যদি একটা বাদুড় হয়ে শূন্যপথে ওই গাছের উপরে গিয়ে আবির্ভূত হয়?

—না, তা সে পারবে না। ওই গভীর উপরকার শূন্যপথও তার কাছে বন্ধ।

নেকড়ের চিৎকার এখন বেশ ভালো করেই শোনা যাচ্ছে। সে কী ক্ষুধিত চিৎকার! তার প্রভাবে দিকে দিকে প্রতিধ্বনিও যেন হয়ে উঠল বিষাক্ত!

আমার সামনে পড়ে ছিল বিশালগড়ে আসবার সেই সুদীর্ঘ সোজা রাস্তাটি। হঠাৎ দেখলুম, সেই রাস্তার উপর দিয়ে কারা এগিয়ে আসছে এইদিকেই। সচমকে ভালো করে তাকিয়ে বুঝলুম, কয়েকটা লোক মাথার উপর কী যেন একটা বহন করে আনছে।

অবিনাশবাবু সেই বড়ো গাছটার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি ত্রস্তকণ্ঠে ডাকলুম, অবিনাশবাবু!

অবিনাশবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, কী?

—পথ দিয়ে কারা আসছে!

অবিনাশবাবু ফিরে দাঁড়িয়ে পথের দিকে করলেন দৃষ্টিপাত। কয়েকটি মুহূর্ত নীরব থেকে বললেন, পথ দিয়ে কারা আসছে, বুঝতে পারছেন না?

—কারা আসছে?

—সেই বেদের দল। আর ওদের সঙ্গে রয়েছে সেই বড়ো সিন্দুকটা, যার ভিতরে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে থাকে রুদ্রপ্রতাপ।

আমি সভয়ে বললুম, রুদ্রপ্রতাপকে নিয়ে ওরা আমাদের সামনে আসতে সাহস করবে? সে তো এখনও মৃত্যুবৎ!

গভীর স্বরে অবিনাশবাবু বললেন, সূর্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

সূর্য তখন একটা ঝিমন্ত লাল আলোর গোল ফানুসের মতো। আর মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যেই সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে দিকচক্রবালরেখার ওপারে।

অবিনাশবাবু বললেন, আপনি কি জানেন না বিনয়বাবু, ভোরের আলো ফোটবার আগেই রাতকানা পাখিদের ঘুম যায় ভেঙে? তেমনই বোধহয় সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যা আসবার আগেই দিনকানা রুদ্রপ্রতাপের দেহে জাগে জীবনের চিহ্ন। বেদেরা আমাদের কাছে আসবার আগে সূর্যের মুখ আর আমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাব না। অতএব আমাদের এখন বেগে দৌড়ে এগিয়ে যেতে হবে ওই বেদেগুলোর দিকে।

আমি সবিস্ময়ে বললুম, কেন অবিনাশবাবু?

—সূর্যাস্তের পরমুহূর্তেই রুদ্রপ্রতাপ হবে সিন্দুকের ভিতর থেকে অদৃশ্য।

—বেদেরা দেখছি দলে ভারী। ওরা আমাদের বন্ধু নয়।

অবিনাশবাবু আমার হাত ধরে টানতে টানতে অগ্রসর হয়ে বললেন, জানি বিনয়বাবু, জানি। ওরা আমাদের শত্রু। আমরাও ওদের বন্ধু নই। আমরাই ওদের আক্রমণ করব। বার করুন রিভলভার, দৌড়ে চলুন-আর কথা কইবার সময় নেই!

অবিনাশবাবুর সঙ্গে সঙ্গে আমিও হলুম সবেগে ধাবমান। তিনিও রিভলভার বার করলেন, আমিও।

উত্তেজনায় আর একটা মস্ত বিপদের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। তখন আমাদের খুব কাছ থেকেই শোনা যাচ্ছে নেকড়েদের ভীষণ চিৎকার। তাদের ঘন ঘন চিৎকারে থর-থর করে কঁপিছে যেন সারা বন । তারা এসে পড়ল বলে।

খানিকটা ছুটেই আকাশে শঙ্কিত চক্ষু তুলে দেখলুম, চোখের আড়ালে নেমে গিয়েছে তখন সূর্যের আধখানা।

আমাদের ওইভাবে দৌড়ে যেতে দেখে বেদের দল দাঁড়িয়ে পড়ল। বাহকরাও সিন্দুকটা নামিয়ে রাখলে মাটির উপরে। তারপর লক্ষ করলুম, তাদের প্রত্যেকেরই হাতে কী যেন চকচক করে উঠছে। অস্ত্র?

তাদের দলে লোক ছিল প্রায় পনেরো-ষোলো। আমরা মোটে দুজন দেখে তাদের সাহস বেড়ে উঠল। তারাও বেগে এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

যখন আমরা তাদের কাছ থেকে বিশ-পঁচিশ হাত দূরে এসে পড়েছি, অবিনাশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'রিভলভার ছুড়ুন বিনয়বাবু, রিভলভার ছুড়ুন!' দৌড়তে দৌড়তেই রিভলভার তুলে তিনি ঘোড়া টিপতে লাগলেন। আমিও ছুড়তে লাগলুম রিভলভার।

তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল হতভম্বর মতো। একটা বেদে গুলি খেয়ে মাটির উপরে দাড়াম করে পড়ে গেল এবং তারপরে আবার দাঁড়িয়ে উঠে আর্তনাদ করতে করতে পালিয়ে গেল ওপাশের গভীর বনের দিকে। আর একটা বেদেও গুলি খেয়ে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। তারপর অন্য বেদেগুলোরও সাহস গেল একেবারে উবে। তারা সকলেই উদভ্রান্তের মতো যে যেদিকে

পারলে দৌড় মেরে সরে পড়ল। পরমুহূর্তে আমরা গিয়ে দাঁড়ালুম সেই সিন্দুকটার পাশে।

রিভলভারটা বাম হাতে নিয়ে অবিনাশবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আগ্নেয়াস্ত্রে পিশাচ মরে না। পিশাচ বধ করতে গেলে তার মুণ্ডটাকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করতে হবে দেহ থেকে! ডান হাত দিয়ে কোমরে ঝোলানো ভোজালিখানা তিনি টেনে বার করে ফেললেন।

সেই সঙিন মুহূর্তেও আমার দৃষ্টি তখন আকৃষ্ট হল অন্য একদিকে। পথের ওপারে ছিল একটা মাঝারি আকারের এবড়ো-খেবড়ো মাঠ এবং তারই প্রান্তে ছিল গভীর জঙ্গল। আড়ষ্ট নেত্রে দেখলুম, সেই জঙ্গলের ঝোপঝাপের ভিতর থেকে লাফ মেরে মাঠের উপরে এসে আবির্ভূত হচ্ছে নেকড়ের পর নেকড়ে। তারা প্রত্যেকেই ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকেই। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, অবিনাশবাবু! নেকড়েরা এসে পড়েছে।

অবিনাশবাবু দৃঢ়স্বরে বললেন, আসুক নেকড়ের দল! পিশাচকে মেরে তবে আমরা মরব! ওই দেখুন, সূর্য ডুবে গিয়েছে, আর সময় নেই।

তাঁর মুখের কথা ফুরোতে-না-ফুরোতেই সিন্দুকের ডালাটা খুলে গেল সশব্দে। তারপর স্তম্ভিত চক্ষে দেখলুম, সিন্দুকের ভিতরে সিধে হয়ে বসে আছে জাগ্রত রুদ্রপ্রতাপের ভয়াল মূর্তি। তার দুই চক্ষে জ্বলছে হিংস্র দৃষ্টি এবং ওষ্ঠধরে মাখানো রয়েছে তীব্র বিদ্রুপের হাস্য।

হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠে লাফ মেরে সিন্দুকের বাইরে এসে পড়ল। তারপর বিকট অট্টহাস্য করে সচিৎকারে বললে, ওরে আয় রে, আয় রে আয়, আমার বনের সন্তানেরা! তোদের সামনে এসেছে বলির পশু, দৌড়ে

আয় রে, দৌড়ে আয়! তোদের উপবাস ভঙ্গ কর, নিবারণ করা তোদের উদরের ক্ষুধা!

প্রায় সারা মাঠটাই তখন যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। যেদিকে তাকাই সেইদিকেই দেখি নেকড়ের পর নেকড়ে—চক্ষু তাদের রক্তবর্ণ, হাঁ-করা মুখ তাদের দন্ত-কণ্টকিত, কণ্ঠ তাদের ভৈরব গর্জন পরিপূর্ণ।

অবিনাশবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন রুদ্রপ্রতাপের পিছন দিকে। প্রথমটা তিনিও থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বাঘের মতো ঝাপিয়ে পড়লেন রুদ্রপ্রতাপের উপরে এবং চোখের পলক পড়বার আগেই দুই দুই বার চালনা করলেন তাঁর হাতের ভোজালিখানা।

একটা প্রচণ্ড আকাশ-ফাটানো বিকট চিৎকার, এবং তারপরই একদিকে ছিটকে পড়ল রুদ্রপ্রতাপের মুণ্ডটা এবং আর একদিকে ধরাশায়ী হল তার মুণ্ডহীন দেহটা।

চারিদিক একেবারে স্তব্ধ। নেকড়েদেরও চিৎকার শোনা যাচ্ছে না। বিপুল বিস্ময়ে ফিরে দেখি, নেকড়ের দল আবার ছুটে ফিরে যাচ্ছে মাঠের উপরকার নিবিড় অরণ্যের দিকে। রুদ্রপ্রতাপের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই কি ফুরিয়ে গেল তার অপার্থিব মন্ত্রশক্তি? এতক্ষণ তারই ইচ্ছাশক্তি কি চালনা করছিল ওই নেকড়েগুলোকে?

হঠাৎ অবিনাশবাবু চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, দেখুন বিনয়বাবু, এদিকে ফিরে দেখুন!

ফিরে দেখলুম এক অভাবিত ব্যাপার। রুদ্রপ্রতাপের মুণ্ডহীন দেহ এবং দেহহীন মুণ্ড আশ্চর্য রূপান্তর গ্রহণ করছে। কয়েক মুহূর্ত পরে সেখানে পড়ে রইল কেবল একটা বড়ো ও একটা ছোটো জীর্ণ ধূলির পুঞ্জ। যে

অভিশপ্ত দুর্দান্ত আত্মা এই রক্ত-মাংসে গড়া দেহটাকে অস্বাভাবিক রূপে জীবন্ত করে রেখেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, আজ সেই আত্মার সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই নশ্বর দেহটা আবার ফিরে পেয়েছে তার স্বাভাবিক অবস্থা। ধূলায় গড়া নশ্বর দেহ আবার পরিণত হয়েছে ধূলিপুঞ্জে।

অবিনাশবাবু অভিভূত স্বরে বললেন, ভগবানকে ধন্যবাদ দিন বিনয়বাবু! এতকাল পরে রুদ্রপ্রতাপের শাপমুক্ত দেহের আবার সদগতি হল। আর সে জাগবে না।

খানিকক্ষণ আমরা দুইজনেই ভারাক্রান্ত মনে সেইখানে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলুম নীরবে। —অরণ্যের উপরে ধীরে ধীরে নেমে আসছে। অন্ধকারের যবনিকা, কিন্তু সে অন্ধকারকে আজ যেন মনে হল স্নিগ্ধ, শান্ত, সুন্দর।